গল্পে বিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

তারকচন্দ্র ঘোষ

প্রতিমা প্রকাশনী
স্টেশন রোড : চুঁচুড়া : হুগলী

প্রকাশক :
প্রতিমা প্রকাশনী
স্টেশন রোড, চুঁচুড়া. হুগলী।

প্রথম প্রকাশ :
নভেম্বর ১৯৬১

মুদ্রক :
শ্রীদীনবন্ধু দে
আর্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস
বড়বাজার, চন্দননগর, হুগলী।

প্রাপ্তিস্থান :
জয়গুরু পুস্তকালয়
১২/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

মহেশ লাইব্রেরি
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

দত্ত বুক ষ্টল
৮/১ বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, বিধান সরণি, কলি-৬

ভূমিকা

ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

আজ আমরা যে যুগে বাস করছি—সে যুগে কি ব্যক্তি মানুষ, কি গোটা বিশ্বের মানুষ, সব কিছুরই এক অমোঘ নিয়ন্তা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি। অশনে-বসনে, আহারে-বিহারে, প্রমোদে-ব্যসনে, যোগাযোগ-প্রচারণায়, দেশরক্ষায়-দেশের প্রগতিতে—যেদিকেই তাকানো যাক্, সব কিছুরই নিয়ামক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির-মান এবং পরিমাণ। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রসরতার ভিত্তিতেই অর্থনীতি থেকে বিশ্বশান্তি, তার ভিত্তিতেই উন্নত-উন্নতিশীল-অনুন্নত রাষ্ট্রের শ্রেণীবিন্যাস।

রেডিও-টেলিফোন-টেলিভিশন-কম্পিউটার, রাডার, পরমাণু শক্তি, লেসার, জিন-প্রযুক্তি, টেষ্টটিউব বেবি, হার্টট্রান্সপ্লান্টেশন, অ্যান্টিবায়োটিক, প্লাস্টিক সার্জারি—নানা শব্দ নিয়তই আছড়ে পড়ছে আমাদের শিক্ষিত-অল্প-শিক্ষিতদের কানে নানা গণমাধ্যমের কল্যাণে। যে গণমাধ্যমগুলির প্রত্যেকটিই আবার বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দান।

এই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিঘাত—সাধারণ জন বা জনসাধারণের জীবনে কি এবং কতোখানি? এ প্রশ্নের জবাব যে কেউ আমরা মেলাতে পারি—অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে, এবং সে দেশ যদি সত্যি বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অগ্রসর হয়, তাদের প্রতিদিনেই যদি সে বিজ্ঞান সত্যিই সহজ-স্বচ্ছন্দ রূপ নিয়ে ঘিরে থাকে তাদের জীবন।

যেমন উদাহরণ ধরা যাক্—একটি দুর্ঘটনায় মুমুর্ষু মানুষকে আমেরিকার একটি অ্যাম্বুলেন্স তুলে নিয়ে যেতে যেতেই তার অর্ধেক চিকিৎসা, তার ব্লাড গ্রুপ, গাড়ীর মধ্যেই ট্রান্সফিউশন সুরু হবে—এবং হাসপাতালে পেঁছিনোর সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারে-স্ক্যানারে-অপারেশন টেবিলে যন্ত্র ও মানুষের সমন্বয়, জীবনমৃত্যুর লড়াইয়ে মানুষটিকে ফিরিয়ে আনবে জীবনে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে। ভাবতে পারা যায়, এমন কথা—এদেশে, একালে?

দোষ কি শুধু সরকারের, অনগ্রসরতার? না। বড়ো অভাব বিজ্ঞান-সচেতনতার, বিজ্ঞান-মনস্কতার। আমাদের দেশে বিজ্ঞান আবদ্ধ হয়ে রইল ডিগ্রীতে, টেকনোলজি আবদ্ধ হয়ে রইল শিল্পপতি বা মেকানিকের হাতে।

অথচ জনসাধারণের জীবনে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে না দিলে জড়িয়ে না দিলে, বিজ্ঞানের সঙ্গে দেশের সেতুবন্ধন ঘটে না। অন্যদেশগুলি—ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়ায় বিজ্ঞান-উন্নত, কারণ মানুষের মনও সেখানে তৈরী হচ্ছে প্রথম থেকেই, বিজ্ঞানের ওপর আরো নতুন চাহিদা আসছে সে সব মন থেকেই।

একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুক্‌নো পাতা আপনি ঝরে পড়ে। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরোগুলি নিয়তই খসে'খসে ঝরে পড়ছে। তাতে চিত্রভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। এরই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই অভাব আমাদের শুধু বিদ্যার বিভাগে নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও অকৃতকার্য করে রাখছে।

বিজ্ঞানের দেশে, বিজ্ঞানের টুকরো পাতা, হাল আমলের খবর ছড়িয়ে দেবার—উপকরণ লোকপ্রিয় বিজ্ঞানেব বই, গণমাধ্যম, অভিজ্ঞ ভিসুয়াল ফিল্ম, মিউজিয়াম, আরো অনেক কিছু। এর ভিত গাঁথা সুরু হয় শিশু কিশোর থেকে বয়স্ক নিয়ে। আমাদের দেশে এর সব কিছুই সুরু হলেও অপরিণত, অপুষ্ট।

বিজ্ঞানকে লোকপ্রিয় করার প্রধান মাধ্যম—এখনো 'পপুলার সায়েন্সের' বই। সে বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর একটি উক্তি স্মর্তব্য: বিজ্ঞানের কথাও রূপকথা, এ রূপকথাও সর্বজনবোধ্য করে বলা যায়।' যায়, কিন্তু রূপকথা বলিয়েরা কোথায়? প্রথম যে সব নাম মনে আসবে, জুলে ভার্ণে, ওয়েলস, জিনস, আসিমভ; তাঁদের পাল্লায় ভারতীয় বা বাঙালী লেখক কোথায়?

বাঙলায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের অনেক লেখক এসেছেন, বর্তমানে আছেন, ভবিষ্যতেও আসবেন। স্বভাবতই, কালের নিয়মে—তাঁদের পরিবেশনে পার্থক্য থাকবে, স্টাইল-কনটেন্টও পালটাবে। কেউ মামুলিই থাকছেন, কেউ বা চমক দিচ্ছেন মৌলিক স্টাইলে।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক খ্যাতনামা চিকিৎসক ডক্টর তারকচন্দ্র ঘোষ, যখন তাঁর 'গল্পে বিজ্ঞান' বইটি মতামতের জন্য আমার কাছে আনলেন—সত্যি বলতে কি, মামুলি বইয়ের মতো অলস প্রহরে পাতা ওলটান সুরু করি। কিছুক্ষণের মধ্যেই, সোজা হয়ে বসতে হলো, ভ্রু কুঞ্চিত হতে থাকল, আরো মনোযোগ, আরো নতুন বিষয়—আরো তত্ত্ব-তথ্যের সুস্বাদু এক পরিবেশন,

আমাকে বিস্মিত—পরে বিমুগ্ধ করে তুলল। নিঃসন্দেহে, এ গ্রন্থ—প্রচলিত বাংলার পপুলার সায়েন্সে এক অভিনব সংযোজন।

বইটির প্রথম বিস্ময়—আধুনিকতম বিজ্ঞানের স্বচ্ছন্দ আনাগোনা সারা বইটি জুড়ে, যার মধ্যে আছে—কম্পিউটার, রোবট, ভারী জল, গ্রহান্তর যাত্রা, ট্রাকিয়ন, আদি সভ্যতা বা ক্যালকোলিথিক সভ্যতা, পরমাণু-ঘড়ি, ট্রান্স প্লান্টেশন, হলোগ্রাম, স্টার ওয়ার, অনকোজিন, ই. এস. পি. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি। বিস্ময় লাগে—সহজ সরল ভাষায় এইসব বিষয়কে অংকের জটিলতার সাহায্য না নিয়েই আলোচনা করেছেন এমন একজন লেখক, যিনি পেশায় চিকিৎসা বিজ্ঞানী। বিষয়গুলির অনেক নাম আমরা চিনি, কিন্তু জানি কজন?

দ্বিতীয় প্রশংসনীয় তাঁর বাচনভঙ্গী। দাদু, মৃত্যুঞ্জয়, বীরু, হীরু সহজ তাদের আনাগোণা, (যদিও বীরু কিছুটা পরবর্তী সংস্করণে নতুন হলে ভালো)। দাদু চরিত্র, বাঙলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে—এক স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি হলো। এর একমাত্র কাছাকাছি চরিত্র—প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদা'।

অনেক তথ্য এ বইটিতে আমারো জানার দিগন্ত প্রসারিত করেছে—আরবো ভাইরাস, সুগার গ্লাইডার, লোয়ার পাখি, ইডিস ইজিপটাই। এখানেও ঘনাদার প্রতিদ্বন্দ্বী—দাদু।

একটিমাত্র জিনিসে আমার আপত্তি আছে—যেটি প্রথম কাহিনী 'নকলের আত্মহত্যা, আসলের অপমৃত্যু' সে কাহিনীটি শেষ কাহিনী হলে আমি তৃপ্ত হতাম। মৃত্যুঞ্জয় আগেই মৃত্যুপথে—কাহিনীতে আনাগোনার আগেই। এ ভাবনা লেখকের স্বাধিকার, কিন্তু পাঠকেরও নিবেদন।

'নীলকণ্ঠ বাবার নীল বিষে'র এই দেশে—এসব বইয়ের প্রয়োজন আজ অনেক। তেমনি স্বপ্নময় 'টাউসেটি' গ্রহের, স্বপ্নের রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই বই পড়ে, কিশোরদের এবং বয়স্কদেরও ভাবনা জাগুক—অমনি পরিণতিতে আমাদের পৃথিবীর বিজ্ঞান কবে পেঁছিবে।

লেখককে আমার শুভেচ্ছা জানাই, আর দাবী জানাই—আরো এমনি লেখার। জীবন বড়ো স্বল্প। কতো জানাই যে বাকী থাকে, থেকে যায়।

সূচীপত্র

নকলের আত্মহত্যা আসলের অপমৃত্যু

বিজ্ঞান-দাদুর বৈঠকখানা। দাদু মজলিসী গল্প করতেন আসর জমিয়ে। ফি রোববার। ছেলে-বুড়ো সবাই শুনতো হাঁ করে। তবে বীরু-হীরু মাঝে-মধ্যে চোখালো প্রশ্নবাণে দাদুকে জেরবার করে তুলতো। স্কুল-ডিঙানো ছাড়পত্র পায়নি, তবে চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ। আর তাই, তারা কাড়তে পেরেছিল দাদুর স্নেহের সিংহভাগ। অবশ্য গ্রাম-সুবাদে দাদু। আশী ছুঁই ছুঁই বয়স। তবু দেহের কাঠামোটা বেশ মজবুত। টকটকে দুধে-আলতা রঙ। মাথায় পাতলা পাকা চুল। টানা ভ্রূ আর প্রশান্ত চোখে পুরু লেন্সের চশমা।

এমনি এক গল্পের আসরে বীরু হঠাৎ চোখ নাচিয়ে বলল: 'দাদু তোমার কিন্তু সাহস বলিহারি!'

'কেন?'—আশ্চর্য ভঙ্গিতে দাদু তাকালেন।

'তুমি নাকি পেল্লায় একটা ভূত মেরেছিলে, একচড়ে?'—বীরু হাত নেড়ে জিগোস করল।

'চড় না, চাবি। তা তোদের কে বলল?'

'দিদা।'

'হুঁ। দিদার যে ভিরমি হয়েছিল। সে কথা কী বলেছে?'

'না তো'। থতমত খেয়ে বীরু বলল।

'তা বলবে কেন? মানে লাগবে যে। তবে শোন ব্যাপারখানা।'

দাদু বলতে লাগলেন: 'শিউলি-ঝরা শরতের সকাল। দিনটা ছিল বেস্পতিবার, বেশ মনে আছে। খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছি আর এক চুমুক করে চা খাচ্ছি। হঠাৎ একটা ঝনঝন শব্দ। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, একটা ট্রাক। থামালো বাড়ির সামনে। কী ব্যাপার? উঠে দাঁড়ালাম। দেখি, মৃত্যুঞ্জয় গাড়ি থেকে নামছে। অবাক হলাম। হপ্তা দুয়েক আগে সে তার করেছিল। আমার ওজন তার করে জানাতে। জরুরী। এর মধ্যে আবার কী দরকার পড়ল? কী জানি—'

'ওজন কেন?'—হীরুর অবাক প্রশ্ন।

'তখন কী ছাই বুঝেছি। মনে করলাম, হয়তো গবেষণার জন্য।'

তারপর দাদু কিছুক্ষণ চুপ। কপাল দু'হাতে চেপে আকাশ-পাতাল কী যেন ভেবে নিলেন। ধরা গলায় বলতে শুরু করলেন :

'জানিস্, মৃত্যুঞ্জয় ওরফে মিতু ছিল আমার বাল্যবন্ধু। এক ক্লাসে পড়তাম। অংকে একশো পেয়ে ফি-বছর পরীক্ষায় প্রথম হতো। তবে বিজ্ঞানে আমার সংগে এঁটে উঠতে পারত না। তাই সে রসিকতা ক'রে আমায় ডাকত 'বিজ্ঞানব্রত' বলে। সেই-যে কবে থেকে 'বিজ্ঞানব্রত' নামটা চালু হয়েছে, এখনো চলছে। আসল নাম চাপা পড়ে গেছে। আমার আসল নাম জানিস তো ? জ্ঞানব্রত। থাক্ সে-সব কথা।'

'কেন দাদু ? বল না তাঁর কথা। শুনতে ভালই লাগছে।' বীরু-হীরু এক সংগে বলল।

'তাঁর গুণের কথা কী বলে শেষ করা যায় ?' দাদু আবার শুরু করলেন : 'ডাক্তার হলো। দেশী-বিদেশী বহু ডিগ্রী পেল। বম্বেতে চুটিয়ে প্রাকটিস্ শুরু করল। রিভার সাইড রোডে তাঁর বাড়িটা চোখের সামনে এখনো জলজলে। শুধু কী ডাক্তার ? পদার্থ বিজ্ঞানী, আরো কত কি। গবেষণায় ডুবে থাকত। শেষ কালটা এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াত। আজ জাপান, কাল জার্মান, পরশু হয়তো মার্কিন মুল্লুকে।'

'তোমাকে নিয়ে যেত না ?'—হীরু জিগ্যেস করল।

'তা নিয়ে যেত বৈকি। গবেষণার বিষয়-বস্তু নিয়ে আলোচনা হতো। অবাক হতাম।'

'মিতু-দাদু আবার কবে আসবে ? বিদেশের গল্প শুনবো।'

'সে আর আসবে না রে।'—দাদু ভারি গলায় বললেন।

'কেন ?'

সে কথাই তো বলতে যাচ্ছিলুম। মিতুকে দেখে তড়িঘড়ি দরজা খুলে দিলাম। চা-পর্ব শেষে জিগ্যেস করলাম, 'হাঁরে, ট্রাক যে এখনো দাঁড়িয়ে। ভাড়াটা কী মিটিয়ে দেব ?'

সে মৃদু হেসে বলল, 'নাঃ নাঃ। ভাড়া আগাম মিটিয়ে দিয়েছি। ফিরবো তিনটেয়। ওটাতেই।'

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা জিরিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় মিতু আমার হাতে দিল একটা দলিল আর চাবি। আমি অবাক চোখে জিগ্যেস করলাম, 'এগুলো নিয়ে কী করবো।'

মিতু ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি টেনে বলল, 'বয়স তো হলো।

শরীর-গতিকের কথা কী বলা যায় ? তাই বম্বের বাড়িটা আর বিষয়-সম্পত্তি সবই তোর ছেলের নামে উইল করে দিয়েছি। দোতলায় শোবার ঘরে বড়-সড় একটা বাক্‌স আছে। কালো রঙের। এটা তারই চাবি।'

মিতু খোস-মেজাজে দেশ-বিদেশের গল্প বলছে, আর আমি তন্ময় হয়ে শুনছি। হঠাৎ মনে হলো মিতু জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। মুখ ফ্যাকাশে। কথা আটকে আটকে যাচ্ছে। আমি তখন জিগ্যেস করি, 'তোর কী কোন কষ্ট হচ্ছে ?'

সে হাত দিয়ে বুকের মধ্যিখান চেপে ধরে বলল, 'শরীরটা কী' রকম আনচান করছে।'

সংগে সংগে পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডাকলাম।

ডাক্তারবাবু এলেন। পরীক্ষা ক'রে বললেন, 'কিছু করার নেই। দেয়াল-ঘড়ি তখন তিনটে ঘা মারল ঢং ঢং ঢং।'

'আচ্ছা দাদু, মৃত্যুর সময়টা কী উনি জানতেন ?'—হীরু জড়িয়ে-জড়িয়ে জিগ্যেস করল।

দাদু নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন। ভিজে ভিজে গলায় বললেন, 'মিতু-ডাক্তার আবার পদার্থ-বিজ্ঞানীও বটে। হয়তো কম্‌পিউটারে মৃত্যুর সঠিক সময় জেনে নিয়েছিল। তাই মৃত্যুর আগে বন্দোবস্ত সব পাকা। মায় বহনকারী ট্রাকটা পর্যন্ত।

'ঘটনার দিন-চারেক বাদে গেলাম বম্বে, মিতুর বাড়ি। সংগে তোদের দিদা। দোতালা বাড়ি। নিচে চেম্বার। পিচ ঢালা রাস্তার ওপর। চেম্বারের ভিতর দিয়ে অন্দর-মহলে ঢোকার দরজা আছে। প্রধান রাস্তা ছেড়ে একটা গলির মধ্যে কয়েক পা হেঁটে গেলেই সদর দরজা। চেম্বার নিশ্চয়ই বন্ধ থাকবে। তাই স্থির করলাম, সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবো। দেখি, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আন্দাজ করলাম, চাকর-বাকর ভেতরেই আছে। ডোর-বেলের বোতাম টিপলাম। বার কয়েক। নাঃ কোন সাড়া শব্দ নেই। বিরক্ত বোধ করলাম।

'এক অপরিচিত বয়স্ক ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, 'যান না চেম্বারে। ডাক্তারবাবু তো ওখানে।'

'ভাবলাম, মিতু বোধহয় জরুরী রোগীপত্তর দেখার ভার অপর কোন ডাক্তারের ওপর দিয়ে গেছে। অগত্যা চেম্বারের দিকে পা বাড়ালাম। আমি আগে আর তোদের দিদা পিছনে। চেম্বারে ঢুকতেই আমার চক্ষু

চড়কগাছ। এ কী! মিতু! মাথার মধ্যে একটা শিরশিরানি অনুভব করলাম। তবে চকিতে ব্যাপারটা ঠিকঠাক বুঝে ফেল্‌লাম। পতনের তালটা সামনে নিলাম। তোদের দিদা তো মিতুকে দেখেই ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। 'উফ্ ভূ—ভূ—ত।' চেঁচিয়ে উঠল। পড়ে যাচ্ছিল। জাপটে ধরে ফেললাম।

'তারপর আমরা এলাম সদর-দরজার কাছে। তোদের দিদা তো বাড়িতে ঢুকতে নারাজ। অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করলাম। ফের ডোর-বেলের বোতাম টিপলাম। নাঃ, কা কস্য পরিবেদনা।

'খানিক চিন্তা করলাম। চকিতে মনে হলো, এখানে বিজ্ঞানের কোন যাদু পুরোদস্তুর কাজ করছে। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। তোদের দিদা নিজের মনে গজরাতে লাগল।

'হঠাৎ নজরে পড়ল একটা চাতাল। দরজার একপাশে। শ্বেত পাথরের তৈরী। ওপরে পায়ের ছাপ, স্পষ্ট। গভীরভাবে খোদাই করা। সহসা মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। চটপট ছাপের ওপর দাঁড়ালাম। অবাক কাণ্ড। দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল। দু'জনে ঢুকে পড়লাম। দরজা আপনা হতে বন্ধ হয়ে গেল। তোদের দিদা ভয়-চোখে আমার দিকে তাকাল। থমথমে গলায় বলল, 'লোকজন তো কাউকে দেখছি না। দরজা খুললো কে?'

'আমি অভয় দিয়ে সংক্ষেপে বললাম, 'এটা বিজ্ঞানের কারসাজি।'

'যা হোক, আমি চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলতে-ফেলতে এগিয়ে গেলাম। আর-এক বিস্ময় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

'ওপরে ওঠবার সিঁড়ির মুখে আসতেই আক্কেল গুড়ুম। তোদের দিদা তো ভয়ে হাউমাউ করে উঠল। প্রকাণ্ড এক অ্যালসেশিয়ান। গায়ে ছোপ-ছোপ দাগ। জ্বলন্ত চোখের কোঠর থেকে বেরুচ্ছে বিদ্যুতের ঝলকানি। কুকুরটা শুয়ে ছিল জিব বের করে। আমাদের দেখে তড়াং করে স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠল। দাঁড়ালো অবিকল মানুষের মতো। তাও প্রায় ফুট পাঁচ-ছয়। মুখে কিন্তু শব্দ করল না বা এক-পা এগিয়েও এলো না। আমি বিমূঢ় ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। টের পেলাম বিজ্ঞানের যাদুর গন্ধ। নজরে পড়ল একটা সুইচ-বোর্ড। বোতাম টিপে দিলাম। মুহূর্তে জন্তুটা একেবারে নিষ্প্রভ, নিথর শান্তরূপ।

'আমরা ওপরে উঠলাম। মিতুর শোবার ঘরে ঢুকলাম। ঘর তো না।

ছোটখাটো গবেষণাগার। তল্লাসী দৃষ্টি দিয়ে বাক্সটা খুঁজতে লাগলাম। নাঃ বাক্স-টাক্স কিছুই দেখতে পেলাম না। নজরে পড়ল ঘরের এক কোণে হাঁড়ির মতো দেখতে মস্ত বড় একটা কী। উপুড় করা। কাঠের তক্তার সংগে আঁটা। পরীক্ষা করলাম। দেখি, সেটার গায়ে ছোট্ট একটা ফুটো। ফুটোর ভেতর চাবিটা ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে দিলাম।

'মুহূর্তে ঘটে গেল অঘটন। কানফাটা বিকট শব্দ। মনে হলো বোমা ফাটল নিচে চেম্বারে। সমস্ত বাড়ি থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। বুঝি ভূমিকম্প। তোদের দিদা তো আতঙ্কে আমার হাত চেপে ধরল। আমি আল্‌গা হেসে বললাম, 'ভূতটা কুপকাৎ। এসো দেখবে।'

'নিচে নেমে এলাম। দেখি, একগাদা বৈদ্যুতিক তার মেঝের ওপর ছড়ানো। তার সংগে রয়েছে রকমারি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। তোদের দিদা তো ফ্যালফেলে চোখে তাকিয়ে রইল। তাকে বুঝিয়ে বললাম, 'ভূত না, রোবট। মিতুর প্রতিমূর্তি একটা যন্ত্রমানব।' আমি আরও বললাম, 'ঐ কুকুরও কম্‌পিউটার-চালিত একটা রোবট জন্তু।'

'আচ্ছা দাদু, দরজাটাও কী বিজ্ঞানের ভেল্‌কি?'—বীরুর প্রশ্ন।

দাদু জোরে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আলবৎ। দরজা এমনভাবে কলকব্জা দিয়ে তৈরী যে আমার দেহের ওজনের চাপে ওটা খোলে। চিচিং ফাঁক গোছের ব্যাপার আর কি।'

'রোবট কী?'—বিস্মিত বীরু জিগোস করল।

দাদু সহাস্যে বললেন, 'আধুনিক বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য অবদান। প্রাণহীন একটা যন্ত্র। তবে যন্ত্র না বলে বরং বলা চলে যন্ত্রমানব বা রোবট। বুদ্ধিমান মানুষ রোবটকে এখন লাগিয়েছে দৈনন্দিন নানা কাজে। শল্য চিকিৎসককে সাহায্য করে এমন এক রোবটের নাম হলো—ইউনিমেট পুমা-২৫০। ডুবুরী-রোবটও তৈরী হয়েছে। যেমন স্কারাব-১ ও স্কারাব-২। এদের কাজের ফিরিস্তি শুনলে মনে হবে, বুঝি পুরাণের কোন রূপকথা। লম্বা টেলিফোন কেব্‌ল সমুদ্রে প্রোথিত করবার এমন কি প্রোথিত কেব্‌লের মেরামতি করবার ক্ষমতা রাখে রোবট। এটি সমুদ্রের অতল গভীরে ঘুরে ঘুরে অনায়াসে অনুসন্ধান চালাতে বেশ পোক্ত। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানের ছবি তুলতে, টি. ভি. ক্যামেরায় তোলা ছবি ওপরে ভাসমান জাহাজে পাঠাতে রোবটের জুড়ি নেই। শুধু কী তাই? উদ্ধার করে আনতে পারে ভেঙে-

পড়া বিমানের অংশ বিশেষ। হাল আমলে তো—অনুরণন রোবটের প্রয়োগ শুরু হয়ে গেছে। কলকারখানা আর খনির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। গবেষণা ও ঘর-গৃহস্থালির কাজে এর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

'প্রাচীনকালে কী রোবট তৈরী হতো?'—হীরু অল্প ইতস্তত করে জিগ্যেস করল।

দাদুর কপালে চিন্তা রেখা ফুটে উঠল। কয়েক ঢোঁক জলে গলা ভিজিয়ে বলতে শুরু করলেন: 'অতীতে রোবট শিল্পে যে প্রচণ্ড অগ্রগতি হয়েছিল, তার ইঙ্গিত পাই রামায়ণে। যেমন মারিচের সুবর্ণ মৃগরূপ ধারণ।'

'ও তো রূপকথা।'—বীরু মুখ ফসকে বলে ফেললো।

দাদু যেন খুঁটিয়ে দেখার চোখে বীরুর ভেতরটা দেখে নিলেন। বললেন, 'রূপকথা মানেই কি আজগুবি? রূপকথার গল্পে অনেক অবাস্তব ঘটনার উল্লেখ থাকতে পারে। কিন্তু কাহিনীর সবকিছু মিথ্যা না। জীবন্ত হরিণ যে কখনো সোনার হতে পারে না—এই সহজ সত্য সকলেই বোঝে। কিন্তু এটিকে রোবট বলে ধরে নিতে আমাদের আপত্তি কী?'

'রূপকথা মানে আজগুবি না—মানলাম। সীতার 'অগ্নি-পরীক্ষা' তাহলে কী?'—চোখালো প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিল বীরু।

দাদু সামান্য হেসে বললেন, 'আগুনে ঝাঁপ দিলে কেউ অক্ষত থাকতে পারে না—একথা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। কিন্তু তাই বলে ঘটনাটা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এর রহস্য। সীতা সম্ভবত তাপ-রোধক পোশাক (হিট-সুট) পরেছিলেন। আর তা যদি না হয়, ওটা নিশ্চয়ই সীতার রোবট। পুরাণে উল্লেখ আছে, রাবণ 'ছায়া-সীতা' হরণ করেছিলেন। আসল সীতা লুকিয়ে ছিলেন অগ্নিদেবের কাছে। সেকালে 'অগ্নিদেব' হয়তো কোন প্রযুক্তিবিদের নাম। যাই হোক, ব্যাপারটা বুঝতে রাবণের মোটেই দেরি হয় নি। তাই তিনি উপযুক্ত পাহারায় 'ছায়া-সীতা'কে সযত্নে রেখেছিলেন কোন এক সংরক্ষিত এলাকায়—যেটির নাম হলো 'অশোক বন'। 'ছায়া-সীতা' অদৃশ্য হলেন অনল-শিখার আড়ালে; তৎক্ষণাৎ আসল সীতাকে হাজির করলেন 'অগ্নিদেব'। তাহলে এই 'ছায়া সীতা' কী? রোবট ছাড়া আর কী হতে পারে?'

বীরু-হীরু নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল। 'সীতার পাতাল প্রবেশ—এটা কী'—চটুল ভঙ্গিতে জিগোস করল বীরু।

দাদু মুখ টিপে হাসলেন। বললেন রসালো ভঙ্গিতে, 'স্রেফ আত্মহত্যা—আসলের অপমৃত্যু।'

কুয়া-রহস্য

পৃথিবীর বুকে উছ্‌লে পড়েছে কোজাগরী পূর্ণিমার মোহন আলো ; খোলা জানলা বেয়ে জবরদস্তি ঢুকছে নেশাখোরের মতো। গল্পের মাদকের টানে হাজির হয়েছে হাজারো ঝামেলা-পোহানো বিস্তর মানুষ। দাদু কাপড়ের খুঁটে চশমার কাচ সাফ করে গল্প বলার জন্যে সবে উন্মুখ হয়েছেন, বীরু ঝপ ক'রে জিগ্যেস করে বসল, 'কালিয়-দমন কী সত্যি, দাদু?'

দাদু চোখ মটকে একটু হাসলেন। বললেন, 'গল্পটা কী, শুনি।'

টাটকা শোনা গল্পটা বীরু হড়বড় করে বলতে শুরু করল : 'কালিন্দী হলো যমুনার মধ্যে একটা হ্রদ। জলের তলায় সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে বাস করত কালিয় নামে এক ভয়াল সাপ। বিশাল আকার। তার বিষের তাপে জল ফুটত টগবগ করে। মারাত্মক বিষাক্ত জল খেয়ে পশু-পক্ষী সংগে সংগে মরে যেত। হ্রদের ধারে গাছপালা জলো হাওয়ায় শুকিয়ে যায়। একদিন হলো কী, শ্রীকৃষ্ণের গোটা-কতক গরু ঐ জল খেয়ে ধড়ফড় করে মরে গেল। আর তাই তিনি কালিয়কে পিটিয়ে আধমরা ক'রে হ্রদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন, দলবল সমেত। তারপর থেকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে কালিন্দীর জলের স্বাদ বদলে গেল ; হলো বিষশূন্য আর মধুর মতো মিষ্টি।'

শুনে, দাদু যেন আনন্দে হাততালি দিতে লাগলেন। বললেন, 'বাঃ বাঃ কী চমৎকার রূপকথা! সাপ হলো স্থলচর প্রাণী। জলে বাস করতে যাবে কোন দুঃখে? জল যে ছিল মারাত্মক দূষিত সে-টা বোঝাবার জন্যই সাপের কল্পনা করা হয়েছে। যাক্। এ সম্বন্ধে একটা ঘটনার কথা বলি :

দাদু বলতে লাগলেন 'শেষ-ফাগুনের আগুন-ঝরা এক দুপুর। তালপাতার একটা হাত-পাখা নিয়ে ঘামের সংগে লড়াই করছি। এমন সময় মিতুর চিঠি এলো। বৃন্দাবন যাবার অনুরোধ। সে তখন জল-হাওয়া-মাটি নিয়ে জোর গবেষণায় ব্যস্ত। বৃন্দাবনে সে থাকতো দাউজির মন্দিরের কাছে। একদিন সাত-সকালে হাজির হলাম তার বাসায়।

প্রাতরাশ সেরে মিতু বলল, 'তোকে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাবো। আর সেজন্যই ডাকা।'

দু'জনে একটা টাঙ্গায় উঠলাম। চিম্‌সে টাট্টু টলতে টলতে গাড়ি টানতে লাগল। মসৃণ পিচঢালা রাস্তা। গাড়ি বেশ গড়গড় করে চলতে

লাগল। মিতুকে খুব চিন্তিত মনে হলো। একেবারে চুপচাপ। কিছুদূর যাবার পর টাঙ্গা পাকা রাস্তা ছেড়ে মেঠো রাস্তা ধরল। এবড়ো-খেবড়ো। মাঝে-মাঝে জোর ঝাঁকুনি খেতে হচ্ছে। কোমরের পুরনো বেদনাটা সুযোগ পেয়ে চাগড় দিয়ে উঠল। মিতু কিন্তু গম্ভীর। তাকে ঘাঁটাতে সাহস হলো না। ক্রমে আমরা একটা বিরাট জংগলের কাছে পৌঁছলাম। জংগলের পথ খুব সরু। অগত্যা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। আঁকা বাঁকা পথ ধরে এগোতে লাগলাম। দুধারে চেনা-অচেনা গাছ-গাছালি। গাছভর্তি রঙ-বেরঙের ফোটা ফুল। পাতা থেকে চুঁইয়ে পড়ছে সূর্যের ভাঙা রোদ। মনটা খুশিতে ভ'রে গেল। কিছুদূর যেতেই আমার আনন্দটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। চারদিকে ছোট-বড় গাছপালা দাঁড়িয়ে আছে ন্যাড়া মাথায়। নিচে ঝরে-পড়া পাতাগুলো যেন জলে গেছে। গাছের ছাল খসে খসে পড়েছে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে থমথমে বিষণ্নতা। যেন কোন যাদুকরের মায়াশক্তি-বলে বৃক্ষের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে না পেরে মিতুর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

মিতুর ঠোঁটে হাল্কা হাসি। খুশিতে ডগমগ। কারণ বুঝতে পারলাম না। সে মুখে কিছু না বলে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল। তার পিছু পিছু আরো খানিকক্ষণ হাঁটলাম। নজরে পড়ল একটা পাতকুয়া। মান্ধাতা আমলের। পাড়টা ভাঙা। কুয়োর কাছে কতকগুলো মাটির ভাঁড়। জলভরা। এদিক-ওদিক পড়ে রয়েছে কয়েকটা পাখি। চোখ উলটানো। পেট ফেঁপে জয়ঢাক। হতভম্ব হলাম। মিতুকে কিন্তু উৎফুল্ল মনে হলো। আমার কৌতূহলের মাত্রা তখন বেড়ে গেছে। মিতুকে জিগোস করলাম, 'কী ব্যাপার বলত? এ-যে দেখছি, মৃত্যুপুরী।'

মিতুর চোখে-মুখে এক ধরণের অদ্ভুত প্রসন্নতা। সে কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে বলল, 'কৃষ্ণের কালিয়-দমনের কথা মনে পড়ে? এখানে একটা ছোটখাটো কালিন্দীর খোঁজ পেয়েছি।'

ধাঁধায় পড়ে গেলাম। ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করতে পারলাম না। তাই জিগোস করলাম, 'পাখিগুলি কী মরল জল খেয়ে?'

মিতু ঈগলের মতো ঘাড় উঁচিয়ে ঈষৎ হেসে বলল, 'ঠিক ধরেছিস। গতকাল এভাবে জল তুলে রেখে গেছিলাম।'

আমি ফের জিগোস করলাম, 'তাহলে পাতকুয়ার জল কী দূষিত?'

মিতু ঘাড় নেড়ে বলল, 'তাই-তো মনে হচ্ছে। দেখা যাক পরীক্ষা করে।'

মিতু কুয়া থেকে জল তুলে সাবধানী হাতে বোতলে পুরে নিল।

বাসায় ফিরে মিতু পরীক্ষা শুরু করল। একটা বড বীকারে খানিকটা জল ঢেলে দিল। তারপর সে বীকারে অল্প পরিমাণ পানীয় জল আস্তে আস্তে ঢালল। অবাক কাণ্ড! কুয়ার জলের সাথে পানীয় জল মিশলো না। তেলের মতো পানীয় জল ভাসতে লাগল।

মিতু এবার অন্য একটা বীকারে কুয়ার জল ঢেলে নিল। তাতে একটা থার্মোমিটার ডুবিয়ে দিল। স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে জল গরম করতে লাগল। তাপমাত্রা উঠল ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে। কী আশ্চর্য! জল ফুটলো না। সাধারণ জলের স্ফুটনাঙ্ক তো ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তবে কী এটা সাধারণ জল না? সন্দেহের মাত্রা বেড়ে গেল। তাপমাত্রা আরো বাড়ানো হলো। শেষে জল ফুটতে আরম্ভ করল ১০১·৪২ ডিগ্রী সেলসিয়াসে। অর্থাৎ এর স্ফুটনাঙ্ক হলো সাধারণ জলের চেয়ে ১·৪২ ডিগ্রী বেশী।

তারপর মিতু ডাইলেটোমিটার দিয়ে জলের ঘনত্ব মাপতে শুরু করল। আমি বললাম, 'সাধারণ জলের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঘনত্ব হলো ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। মনে হচ্ছে, কিছু হেরফের হবে।'

যা আন্দাজ করেছিলাম, তাই ঘটল। কুয়ার জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী দাঁড়ালো ১১·৬ ডিগ্রী সেলসিয়াসে।

কুয়ার জল জমে বরফ হলো ৩·৮২ ডিগ্রী সেলসিয়াসে যেখানে সাধারণ জলের হিমাঙ্ক শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস।

মিতু জলের নমুনা পাঠিয়ে দিল বম্বের এক ল্যাবোরেটারিতে। পরীক্ষার ফল জানা গেল কয়েকদিন বাদে। জলের তলটান (২৫°C, ডাইন প্রতি সেমি) হলো ৭১·৯৩ যা নাকি সাধারণ জলের বেলায় ৭১·৯৭। আয়নীয় গুণাঙ্ক (২৫°C) হলো ৩০·৩ × ১০⁻¹⁵ যা সাধারণ জলের বেলায় ১ × ১০⁻¹⁴।

এতক্ষণ দাদু এক নাগাড়ে আউড়ে যাচ্ছিলেন আর বীরু-হীরু হাঁ করে যেন কথাগুলো গিলছিল। হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। বীরু-হীরুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললেন। জিগ্যেস করলেন, 'বল তো জলটা কী?'

'ভারি জল'—বীরুর সপ্রতিভ জবাব।

দাদুর চোখ দুটো আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন, 'সাবাস! বলিহারি তোর বুদ্ধি। এটাকে বিজ্ঞানীরা বলেন, ডয়টরিয়াম অক্সাইড (D_2O)। বিষাক্ত। আসলে কালিন্দী এরকম ভারি জলেই ভর্তি ছিল।'

'ভারি জল কীভাবে তৈরী হয়?'—হীরু হুট করে জিগ্যেস করল।

দাদু গলা ঝেড়ে সাফ করে নিলেন। বললেন, 'জল কী ক'রে তৈরী হয়? হাইড্রোজেন (H) আর অক্সিজেন (O)—এই দুটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিশ্রণে তো?'

বীরু-হীরু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'ভারি জল-ও এভাবে তৈরী হয়। সাধারণ জলে থাকে দুটি হাই-ড্রোজেন পরমাণু আর একটি অক্সিজেন পরমাণু। এর রাসায়নিক সংকেত হলো H_2O। তেমনি দুটি ভারি হাইড্রোজেন বা ডয়টরিয়াম (D)—এর পরমাণুর সংগে একটি অক্সিজেন পরমাণু জুড়ে দিলেই তৈরী হবে ভারি জল। এর রাসায়নিক পরিচয় হলো D_2O। রাসায়নিক গুণবিচারে এটি জল ছাড়া ভিন্ন কিছু না।

'জলকে ভারি বলা হয় কেন?' হীরু ফের জিগ্যেস করল।

দাদু শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'উত্তর সোজা। সাধারণ জলের চেয়ে ভারি। সাধারণ জলে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ২ আর একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ১৬, জলের আণবিক ওজন তাহলে ২+১৬=১৮। ভারি জলের আণবিক ওজন হলো ২×২+১৬=২০। অর্থাৎ যে সংখ্যক সাধারণ জলের অণুর ওজন ১৮ গ্রাম, তার সমান সংখ্যক ভারি জলের অণুর ওজন হবে ২০ গ্রাম।'

'ভারি হাইড্রোজেন কাকে বলে?' বীরুর প্রশ্ন।

দাদু এক ঢোঁক জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, এটা তো আগেই জানতে হবে। নাহলে ভারি জলের ব্যাপার তো বোঝা যাবে না।'

'কোন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে তার পরমাণুর প্রোটন সংখ্যার ওপর।' দাদু বললেন, 'পরমাণুতে নিউট্রন জুড়ে দিলে, তার রাসায়নিক ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না; কিন্তু ওজন বেড়ে যায়। হাইড্রোজেন পরমাণুতে আছে একটি মাত্র প্রোটন। সেখানে নিউট্রন নেই। এবার হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রোটনের সংগে একটি নিউট্রন জুড়ে দিলে তার রাসায়নিক ধর্মের কোন পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ সেটি হাইড্রোজেনই থাকবে; কিন্তু পরমাণুর ওজন বেড়ে হবে দ্বিগুণ। এ-রকম হাইড্রোজেনের নাম ভারি হাইড্রোজেন বা ডয়টরিয়াম।'

'ভারি জল কোথা পাওয়া যায়?' হীরু ব্যগ্রভাবে জিগ্যেস করল।

দাদুর মুখে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। সকৌতুকে বললেন, 'বাজারে।

দাম জানিস্? দু'হাজার টাকা কে জি। অবশ্য সেটা ১৯৭৭ সালের। এখন আরো বেড়েছে।'

'ইস্ বিষের আবার এত দাম হয় নাকি?' সন্দিগ্ধচিত্তে হীরু জিগ্যেস করল।

গম্ভীরমুখে দাদু বললেন, 'তা হবে বইকি। দুষ্প্রাপ্য। প্রকৃতিতে সাধারণ জলের সংগে ভারি জল মেশানো থাকে। তবে অনুপাতে খুবই অল্প। একে আলাদা করা হয় শক্তিশালী তড়িৎপ্রবাহ দিয়ে জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ ক'রে। খুবই ব্যয়সাধ্য।'

'এত চড়া দামে বিষ কেনার দরকার কী'?—ছটফটে গলায় হীরু জিগ্যেস করল।

দাদু চটুল ভঙ্গিতে বললেন, 'বিষ হালে হয়ে দাঁড়িয়েছে অমৃত। ইদানীং ইউরেনিয়াম ভেঙে শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। এ-কাজে সাহায্য করে ভারি জল। বুঝলি?'

ওরা ঘাড় নাড়ল অর্থাৎ বুঝেছে।

গ্রহ হতে গ্রহান্তরে

পৃথিবীর চেহারা শিগগির বদলে যাবে। 'মুনাফাখোর ধনিক-গোষ্ঠি তামাম দুনিয়াটাকে কব্জা করবার জন্যে আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। উন্নতিশীল দেশগুলি মেতে উঠেছে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার নোংরা খেলায়। মারণাস্ত্র তৈরীর কাজে লেগেছে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্। খরচ হচ্ছে সম্পদের সিংহভাগ। ব্যয় সংকোচ করতে হচ্ছে সেচ, কৃষি, পশুপালন, চিকিৎসা, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে। ফলে, উৎপাদন মার খাচ্ছে। বাড়ছে বেকারী ও নিরক্ষরতা। অদূর ভবিষ্যতে অগণিত মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধি, মহামারী, অপুষ্টি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির কবলে পড়ে নির্মূল হয়ে যাবে। আর তার আগে যদি পারমাণবিক যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে, তাহলে রাতারাতি পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে শ্মশানের স্তব্ধতা।'—একটা খবরের কাগজ থেকে তারস্বরে পাঠ করল হীরু।

শুনে, দাদু অল্প হাসলেন। বললেন, 'মিথ্যে না। মোক্ষম সত্যি। তবে তার আগে গোটা পৃথিবী ভেসে যাবে বন্যার জলে।'

'বন্যা! বন্যা কেন হবে?' হীরুর অবাক প্রশ্ন।

'বরফের চাঁই গলে নদ-নদী-সাগর অস্বাভাবিকভাবে ফেঁপে উঠবে।'

'হঠাৎ বরফ গলবে কেন?' বীরু জিগোস করল।

'বরফ গলবে বায়ুমণ্ডলের তাপ বেড়ে।'

তাপ বাড়ার কারণ জিগোস করায় দাদু গম্ভীর মুখে বলতে শুরু করলেন:

'জীবের শ্বাসকার্য থেকে অনবরত বের হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। তাছাড়া কয়লা, পেট্রোল-ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি পুড়ে তৈরী হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। কিছু পরিমাণ গ্যাস শোষণ করে গাছপালা। সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় তারা তৈরী করে চিনি জাতীয় খাদ্য আর অক্সিজেন। নদ-নদী-সাগর আর বৃষ্টির জল অনেকখানি গ্যাস শোষণ করে। এভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর স্বাভাবিক ভারসাম্য ঠিকঠাক বজায় থাকে। কিন্তু আজ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে বন-জংগল সাফ করে গড়ে উঠছে নূতন বসতি। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সংগে সংগে কয়লা, পেট্রোল-ডিজেল প্রভৃতি জ্বলছে বেশী পরিমাণে। ফলে বায়ুমণ্ডলে CO_2

জমতে শুরু করেছে অস্বাভাবিক ভাবে। এভাবে চললে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ক্রমাগত বেড়ে যাবে।'

'বাঁচার কী কোন উপায় নেই?' ঘাবড়ে গিয়ে জিগ্যেস করল বীরু।

'আছে। ভিন্‌গ্রহে আমাদের বসতি গড়তে হবে।'—আশ্বস্ত করে বললেন দাদু।

'ভিন্‌গ্রহে কী মানুষ আছে?'—বীরু ঝটিতি জিগ্যেস করল।

'তা আছে বৈকি। এক শ' আলোকবর্ষের মধ্যে কমসে-কম পঞ্চাশটিতে আছে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা।'

'আলোকবর্ষ কাকে বলে?' হীরুর প্রশ্ন।

'আলোর দ্রুতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। আলোক এক মিনিটে যতদূর যায়—তাকে বলে এক আলোক মিনিট। তেমনি আলোক ঘণ্টা, আলোক দিন ও আলোক বর্ষ।'

'ঐ রকম গ্রহে আমরা কী যেতে পারি?'—বীরু-হীরু সোৎসাহে জিগ্যেস করল।

দাদুর মুখে ফুটে উঠল এক রকমের রহস্যময় হাসি। বললেন, 'আলবৎ। এই-তো সেদিন। মিতুর সংগে গেছিলাম টাউসেটি। সৌর-জগতের বাইরে। বহু কষ্টে মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে এলাম। তবে মহাকাশ দিয়েছে মানসিক শান্তি আর অকৃত্রিম আনন্দের এক চিরন্তন সুখস্মৃতি।' তিনি স্মিতমুখে স্মৃতিকথা শুরু করলেন:

'টাউসেটি দশ আলোকবর্ষের কিছু বেশী দূরে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্তি পেতে বেগ দরকার ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল। মহাকাশ-যানে এই বেগে ওখানে গিয়ে ফিরে আসতে লাগবে আড়াই লক্ষ বছরের কিছু বেশী। এ্যাদ্দিন বাঁচা কারো পক্ষে সম্ভব না। অতিহিমায়ন পদ্ধতিতে যদি-বা বেঁচে থাকা যায়, তাহলে ফিরে এসে হয়তো দেখা যাবে পৃথিবীতে মানুষের কোন অস্তিত্ব নেই, রাজত্ব করছে ভয়ংকর জন্তু-জানোয়ার। থাক সে কথা। আমাদের ফিরে আসতে লেগেছিল মাত্র সাড়ে দশ বছর। তবে বয়স বেড়েছিল দেড় বছর।'

'তা কী ক'রে হয়?'—বীরু-হীরুর চোখে ঘনিয়ে এলো সন্দেহের ছায়া।

দাদু ধমক দিয়ে বললেন, 'বোকারাম। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পড়িস নি?'

বীরু-হীরু চুপ করে রইল দেখে দাদু বলতে আরম্ভ করলেন: 'যে যান প্রায় আলোর গতিতে ছুটবে তার ভেতর সময় কাটবে পৃথিবীর হিসেবে অনেক বেশী ধীর গতিতে। আলোর ৯৯ শতাংশ বেগে ছুটলে ১০·৪ আলোকবর্ষ দূরে টাউসেটি গিয়ে ফিরে আসতে মহাকাশযাত্রীর লাগবে তিন বছর আর পৃথিবীবাসীর তখন কেটে যাবে একুশ বছর। আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র অনুসারে গতিবেগের উচ্চতম সীমা হলো আলোর গতিবেগ। আলোর বেশী গতিবেগ কোন মহাকাশ-যানের পক্ষে সম্ভব না। তবে আমরা গিয়েছিলাম ট্যাকিয়ন-যানে। জ্বালানি হিসেবে তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার করিনি। শক্তির উৎস ছিল ট্যাকিয়ন অণুকনা। যানের চারদিকে ছিল লেসার রশ্মির ঘেরাটোপ। যানের গতি ছিল আলোর বেগের দ্বিগুণেরও বেশী। আমরা ছ'মাসের মধ্যেই টাউসেটি পৌঁছে যেতাম। কিন্তু অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ গ্রহাণু ভরা মহাকাশের পথ গেছে বেঁকে। তাই ঘুরে ঘুরে যেতে সময় লাগল কিছু বেশী। যা হোক, আমরা একদিন মহাকাশ-যানে চড়ে যাত্রা শুরু করলাম। মিনিট দুই পরে হঠাৎ দূরদর্শনের পর্দায় আমার চোখ আটকে গেল। ভেসে উঠেছে চাঁদ। লোভ সামলাতে পারলাম না। রূপকথার চরকা-হাতে বুড়ীকে দেখতে ইচ্ছা হল। বোতাম দিলাম টিপে। ব্যস্ চাঁদের অভিকর্ষের মধ্যে এসে গেলাম।

তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। আধ-ফোটা আলো বিশাল গিরি-শ্রেণীতে যেন সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে। ঘাস-আগাছা-ঝোপ-জংগল কিছুই নজরে পড়ল না। শূন্য মাঠ ধূ-ধূ করছে। দীর্ঘ গভীর শুষ্ক খাল এঁকেবেঁকে চলেছে দূর-দূরান্তরে। খাবহহীন চাঁদে নিঃশ্বাস ফেলা দায়। জলহীন চাঁদে প্রাণীর কোন চিহ্ন নেই; কোনকালে ছিল বলেও মনে হলো না। তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম।

তারপর আমাদের যান ছুটে চলল দুরন্ত গতিতে বুধের দিকে। সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম ইনফ্রারেড টেলিস্কোপের সাহায্যে। শিলাময় গ্রহ। খুবই ছোট। তাই কোন বায়ুমণ্ডল নেই। সেখানে রয়েছে চাঁদের মতো পাহাড় আর গোলাকার খাদ। আরো দেখা গেল টিবি, ঢালু চড়াই ও কিছু নালা—কোনটা সোজা কোনওটা-বা আঁকাবাঁকা। জীবনের কোন লক্ষণ খুঁজে পেলাম না।

এরপর আমাদের যান চলে এলো শুক্রের কাছাকাছি। দূরবীনের সন্ধানী চোখে দেখে নিলাম প্রতিবেশী গ্রহটিকে। পুরু হলদেটে তুলোর

মতো মেঘের আবরণে ঢাকা। তা হবে ২০ থেকে ২৫ কিমি ঘন। এই মেঘ আলো প্রতিফলিত করে বলেই গ্রহটিকে এত উজ্জ্বল দেখায়। রাডার তরঙ্গ পাঠালাম। গোটা বারো গোল খাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ল। পাঁচ হাজার ফুটের বেশী গভীর না। জল নেই। নিজস্ব বায়ুমণ্ডল আছে। তবে খুবই ক্ষীণ। মধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর থেকে অনেক গুণ কম। গ্রহের প্রচণ্ড তাপমাত্রার (গড় তাপমাত্রা ৪৬০° সেন্টিগ্রেড) জন্য প্রাণের সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হলো। পৃথিবীর যমজ-বোন শুক্রকে সেলাম জানিয়ে আমরা সরে পড়লাম।

তারপর অন্তরঙ্গ পরিচয় হলো পৃথিবীর ছোট বোন মঙ্গলের সাথে। নিজস্ব বায়ুমণ্ডল আছে, তবে হালকা। মেরু অঞ্চল ঘিরে সাদা মুকুট। সমতল, এবড়ো-খেবড়ো ভূমি, ছোট-খাটো পাহাড় ও উপত্যকা ছাড়া চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় হাজার-দশেক খাদ। দূরবীনের চোখে ধরা পড়ল গোটা চারেক উঁচু আগ্নেয়গিরি, আঁকাবাঁকা শুকনো নালা। মাটি লাল। জল নেই। প্রাণের অস্তিত্ব টের পেলাম না। তবে শেওলা বা ছত্রাক জাতীয় হীন প্রাণী থাকলে থাকতে পারে। মঙ্গলের আকাশে দুটো চাঁদ—ফোবস আর ডাইমস। ডাইমস দেখতে যেন 'এক খাবলা খাওয়া আধখানা আপেল্।'

অতঃপর আমরা সোজা বৃহস্পতির পথে এগোতো লাগলাম। মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে মহাকাশে হাজার-হাজার গ্রহাণুর (asteroid) দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলাম। এগুলো যেন ছোট ছোট দ্বীপ; পঙ্গপালের মতো পাক খাচ্ছে। এদের মধ্যে প্যালাস, জুনো আর ভেস্টা হলো অপেক্ষাকৃত বড় গ্রহিকা।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের যান এসে পৌঁছাল বৃহস্পতির আকাশ প্রাঙ্গণে। বিরাট গ্রহ। বায়ুমণ্ডলে লাল ছোপ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে বিশাল ঘুর্ণিঝড়ের দরুণ এই লাল ছোপ। গ্রহটিকে গ্যাসীয় দানব বলেই মনে হলো। তাই বৃহস্পতির দিকে আর এগুলাম না। এর গোটা বারো উপগ্রহ সত্যি আমাদের মোহিত করল। গ্যানিমিড ও ইয়োরোপার রূপে পাগল হয়ে মিতু তো দিল বোতাম টিপে। প্রথমে নামলাম গ্যানিমিডে, তারপর গেলাম ইয়োরোপায়। রিমোট সেনসিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে সেখানে জলের সন্ধান পেলাম। তাই প্রাণের সম্ভাবনা প্রবল।'

'রিমোট সেনসিং কী?'—এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন রাখল হীরু।

দাদু বললেন, 'রিমোট সেনসিং মানে কোন বস্তুকে না ছুঁয়ে দূর থেকে তার সন্ধান পাওয়া। তৃতীয় নয়ন আর কী।'

দাদু এক ঢোঁক জলে গলা ভিজিয়ে নিলেন। একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন : 'সৌর মণ্ডলের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ শনিকে দেখবার জন্যে আমাদের যান ছুটে চলল। দূর থেকে তার সুন্দর উজ্জ্বল বলয়রাশি দেখে মুগ্ধ হলাম। ছবি তুলে বিশ্লেষণ করলাম। বোঝা গেল, বলয় হলো বিভিন্ন সাইজের বরফের টুকরো দিয়ে তৈরী। বলয়ের বাইরে গোটা বারো উপগ্রহ। বৃহস্পতির মতো শনিও গ্যাসীয় দানব। আবহাওয়া মণ্ডলে নিরন্তর ঝড় বইছে, প্রায় এক হাজার আটশ' কিমি বেগে। তাই আর এগনো হল না। তবে তার সবচেয়ে বড় উপগ্রহ বা চাঁদ টাইটানের সৌন্দর্য আমাদের মনকে কেড়ে নিল। সেখানে নেমে পড়লাম। মিলল জলের সন্ধান। তবে প্রাণের লক্ষণ না পেলেও তার সম্ভাবনা যে নেই—একথা বলতে পারি না। শনির দুটি চাঁদ—'রিয়া' আর 'ডিয়োন' জমাট বরফের আস্তরণে ঢাকা। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম শনির 'ফাটা চাঁদ' দেখে। বিরাট বিরাট ফাটল চাঁদের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে হলো বুঝি এখুনি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

অনন্তর আমাদের যান ছুটে চলল দুর্নিবার গতিতে। যাত্রাপথে চোখে পড়ল দূর আকাশের বাসিন্দা ধূমকেতু। অগুন্তি। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে লেজ নাড়তে নাড়তে অস্থিরভাবে চলাফেরা করছে। বহুরূপী। আজ একরকম তো কাল একরকম। সূর্য থেকে যখন দূরে থাকে তখন তাদের চেহারা বেশ গোলগাল। সূর্যের কাছাকাছি এলেই গজিয়ে ওঠে লেজ—বর্শার মতো, ঝাঁটার মতো, হাত পাখার মতো। এদের উপাদান হলো বরফ, জমে-যাওয়া গ্যাস (মিথেন, অ্যামোনিয়া, আঙ্গারিক গ্যাস), ধূলিকণা ইত্যাদি। এদের মধ্যে বড় জাতের ধূমকেতু হলো হ্যালি, কোহোটেক প্রভৃতি। লম্বায় কয়েক কোটি কিলোমিটার।

তারপর তেজের মুকুটপরা সৌরজগতের অধিরাজকে অভিবাদন করে তাঁর রাজ্যের সীমানা পার হলাম। আকাশ-ভরা বিপুল নীলিমা ঠেলে যান ছুটেছে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে। একে-একে পরিচয় ঘটল ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটোর সাথে।

ইউরেনাস : সবুজ গ্রহ। সূর্য থেকে ২·৯ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে। মস্ত বড়—পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৬৪ গুণ। গ্রহের চারপাশে কমপক্ষে পনেরোটি উপগ্রহ। দশ-দশটা বলয় গ্রহকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। আবহমণ্ডলে প্রচুর মিথেন গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেল। এজন্যই উরেনাসকে সবুজ দেখায়। বেশ কয়েকটি দৈত্যাকৃতি আগ্নেয়গিরি চোখে পড়ল। তবে জীবন্ত না মৃত বোঝা গেল না। প্রাণের কোন লক্ষণ পেলাম না।

নেপচুন : হালকা সবুজ এক থালার মতো দেখতে। সংগে দুটো উপগ্রহ। এদের মধ্যে ট্রাইটন আমাদের চাঁদের চেয়েও বড়।

প্লুটো : বড়ই মনোহর। এটির উজ্জ্বলতা নিয়মিত বাড়ে কমে। রহস্যময় গ্রহ বলে মনে হলো। তবে সে রহস্য নিরাকরণে কোন চেষ্টা না করে সরে পড়লাম।

অতঃপর আমাদের যান দূর আকাশে পাড়ি দিল। লেসারের সাহায্যে মহাকাশে সংকেত পাঠাতে লাগলাম। রেডিও দূরবীনের কান খাড়া করে রাখা হলো। দূর গ্রহের বার্তা শোনার জন্য বিপুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। নাঃ কোন সাড়া পাওয়া গেল না। দুস্তর মহাকাশে যান ছুটছে দুরন্ত বেগে। সময় কাটছে ধীর গতিতে। কাছাকাছি কোন গ্রহের পাত্তা নেই। ক্রমে উৎসাহে ভাঁটা পড়তে শুরু করল। রসদ ফুরিয়ে আসছে। মনের চোখে ভেসে উঠল মৃত্যুর করাল মূর্তি। অসহায়ভাবে তাকালাম মিতুর দিকে। তখন তার পলকহীন চোখ-জোড়া দূরদর্শনের পর্দায় আটকানো। তার উত্তাল উদ্যম তখনও অটুট।

মিতুর গলা হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বেজে উঠল, 'দেখ, দেখ।' তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পর্দার এক কোনে ভেসে উঠেছে একটি অনুজ্জ্বল বিন্দু। ক্রমশঃ সেটির কলেবর বাড়ার সংগে সংগে বাড়তে লাগল তার ঔজ্জ্বল্য। মন শংকা ও খুশীতে দুলতে শুরু করল। কানের পর্দাজোড়া সহসা চমকে উঠল অস্ফুট শব্দের মৃদু আঘাত খেয়ে। মনে হলো দুর্বোধ্য ভাষায় কারা যেন লহরা টেনে টেনে গান গাইছে। সুস্নিগ্ধ শান্তির ছোঁয়া লাগল মনে।

এরপর একসময় আমাদের যান এসে দাঁড়ালো একটি গ্রহের আকাশ-আঙিনায়। মিতু পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'টাউসেটি'। গ্যাভিটি নব ঘুরালাম। নেমে এলাম একটি পার্বত্য শহরে। ঝকমকে। ঠিক যেন রূপকথার শহর।'

'তারপর ?'—বীরু-হীরুর গলায় উত্তেজনা।

দাদু তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন: 'আমরা স্পেস্-স্যুট ছেড়ে বাইরে এলাম। এক দঙ্গল লোক আমাদের ঘিরে ধরল। সপ্রতিভ বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। দ্বিপদ। কালো দোহারা লম্বাটে গড়ন। উল্টে আঁচড়ানো চুল। কারো কারো মাথায় ছোট্ট জটা। চকচকে কালো চামড়ার নিচে ইস্পাত-সদৃশ শক্ত পেশী। হাত-পা লোমশ। হাতে-পায়ে ছ'টা করে আঙুল। পরনে ঝলমলে রঙ-এর পোশাক। বিচ্ছিরি গলায় তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। নরখাদক নাকি? হাবভাব দেখে আমাদের পরিণাম অনুমান করলাম। বলির পাঁঠার মতো আমরা ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইলাম।

একটি লোক ধীর পদক্ষেপে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। স্নিগ্ধ শান্ত মেজাজ। হাতে দুটো স্বরধর যন্ত্রের (টেপ-রেকর্ডার) মতো কি। আমার ও মিতুর মাথায় একটি করে যন্ত্র চাপিয়ে লোকটি সহানুভূতির চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা তখন মনে মনে বলতে লাগলাম—মেরো না, আমরা অতিথি, আমরা বন্ধু।

কিছুক্ষণ বাদে মাথা থেকে যন্ত্র নামিয়ে নিল সে। নেড়ে-চেড়ে কী যেন দেখলো। তারপর সকলে অভিবাদনের ভঙ্গিতে ওপরে হাত তুললো। আর উল্লাসে যেন ফেটে পড়ল।

বুঝলাম, ও দুটো পট্রীডার গোছের যন্ত্র।

'তাহলে ওনারা তো প্রযুক্তিতে পৃথিবীর চেয়ে অনেক এগিয়ে।' বীরু দুম করে কথাটা বলে ফেললো।

দাদু মৃদু হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই। আরো প্রমাণ আছে।'

দাদু বলছিলেন: 'কম্পিউটারের মতো একটি যন্ত্রের সাহায্যে ওদেশের ভাষা শিখে নিলাম। পৃথিবীর হিসেবে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে। ব্যস, দেশবাসীর সংগে একেবারে মিশে গেলাম। তারপর খানাপিনা, থাকা—সে এক রাজকীয় ব্যাপার। অফুরন্ত আনন্দ আর জয়ের উদ্দীপনায় গ্রহটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলাম।

সবই পৃথিবীর মতো। প্রবাহমান নদনদী, তরঙ্গায়িত অনন্ত সমুদ্র, আর নবীন কিশলয় পুলকিত বনস্থলীর মোহন-স্পর্শে গ্রহটি সঞ্জীবিত। কোথায় আবার বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল ভরে গেছে ফুলে-ফলে-পল্লবে। গগনচুম্বী পর্বতের ললাট-দেশে তুষাররত্নমুকুট দেখে হিমাদ্রির অস্পষ্ট ছবি ভেসে

উঠল চোখের সামনে। পাখির কাকলি আর হিল্লোলিত সমীরণে যেন শুনতে পেলাম প্রকৃতির বিশুদ্ধ আনন্দ সংগীত।

বিস্মিত হলাম ওদেশের অদ্ভুত শাসন-ব্যবস্থা দেখে। সমগ্র গ্রহটি অসংখ্য দেশে বিভক্ত। সবই কিন্তু একটি মাত্র রাষ্ট্রের অধীন। আছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকার। সর্বত্র একই শাসন-ব্যবস্থা। জাতীয় সংহতি গড়ে উঠেছে। সবাই একাসনে বসে সমান সম্পদ ভোগ করে — যেটা আমাদের কল্পনার বাইরে। মনে পড়ল পৃথিবীর কথা—অসহায়ের প্রতি ক্ষমতাশালীর একতরফা অত্যাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার, সামাজিক অব্যবস্থা, জীবনের আনাচে-কানাচে অপুষ্টি, রোগ, অসহনীয় দারিদ্র, হিংসা, লোভ, দ্বেষ ইত্যাদি। নিজেদের দেউলে মনে হলো।'

দাদু স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলেন। মনে মনে কি যেন চিন্তা করে নিলেন। খক্ খক্ করে কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে বলতে শুরু করলেন:

'ওদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুবই মজবুত। ওদের একমাত্র ভয় ভিনগ্রহবাসীদের। লেসার রশ্মিকে লাগিয়েছে প্রতিরক্ষার কাজে। 'অ্যান্টি ম্যাটার' বা প্রতিবস্তু দিয়ে তৈরী করেছে মারণাস্ত্র। কৃত্রিম উপগ্রহকে লাগানো হয়েছে শত্রুর উপর নজরদারি করার জন্য। বেশীর ভাগ সৈন্যকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে অতিহিমায়ন পদ্ধতিতে। দরকার পড়লে অল্প সময়ের মধ্যে জাগবার ব্যবস্থা আছে। এতে বিরাট সুবিধা—খাদ্য বেঁচে যায় আর সৈন্যদের বয়সও বিশেষ বাড়ে না।'

দাদু একনাগাড়ে বলে চললেন: 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে কম্‌পিউটার চালিত রোবট-পুলিশ। বিচারককে সাহায্য করছে উন্নতধরণের কম্‌পিউটার। নির্দোষ অপক্ষপাত বিচার-নীতি হলো বিচারকের প্রধান গুণ। শাসন ও বিচারে সাধুতা ও শুদ্ধতাই হলো তাদের চরিত্রের প্রকৃত গৌরব। তবে দেশটা একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা না। অপরাধী আছে। তবে সংখ্যা নগণ্য। কঠোর শাস্তির ভয়েই হয়তো অপরাধীর সংখ্যা এত কম। অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে শাস্তির বিধান, যেমন চোরের হাত কেটে জুড়ে দেওয়া হয় কোন জন্তুর হাত।

পৃথিবীর মতো ওখানে রয়েছে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও গোষ্ঠী। কিন্তু কোন বিরোধ নেই। একটিমাত্র ধর্ম—প্রেমধর্ম। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই ভেদাভেদ ভুলে সবাই আত্মনিয়োগ করেছে জনকল্যাণে।

ক্ষুদ্রতা-নীচতা-হীনমন্যতার বিষমুক্ত সমাজ অনুপম ঐক্যবোধ ও অন্তহীন ভ্রাতৃত্ববোধের দ্যুতিতে ভাস্বর।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতি অভিনব ও অতুলনীয়। উন্নত ধরণের রোগ নির্ণায়ক যন্ত্রের নির্ভুল রোগ নির্ণয়ের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আমরা চমৎকৃত। ওখানে রয়েছে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনি, রক্ত, অস্থি ইত্যাদির সুসজ্জিত বিপণি। পৃথিবীতে যেমন আছে মোটর গাড়ির অংশ-বিশেষ বিক্রির বিপণি।

শল্য-চিকিৎসকের ভূমিকায় রয়েছে এক বিশেষ ধরণের রোবট। তাছাড়া কসমেটিক সার্জারিতে হয়েছে বিস্ময়কর অগ্রগতি। মানুষের চেহারাটাই পালটে দিচ্ছে। প্রবীণকে বানাচ্ছে নবীন।

উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা দেখে বিস্ময়ে তাক লেগে গেল। ঝকঝকে তকতকে প্রশস্ত রাজপথে চলছে বিভিন্ন ধরণের দ্রুতগামী যানবাহন। জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয় জল। জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। তাই দিয়ে চালান হয় ইঞ্জিন। সমুদ্রে জাহাজ ভাসে জ্বালানীর ওপর। উড়োজাহাজ জ্বালানী নেয় মেঘ থেকে। তাছাড়া রয়েছে পারমাণবিক শক্তিচালিত ট্রেন, জাহাজ, মহাকাশযান। সবচেয়ে আশ্চর্য-যান হলো রকেট-মোটর। শব্দহীন, ধোঁয়াহীন। জলে-স্থলে অন্তঃরীক্ষে অক্লেশে প্রচণ্ড গতিতে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। যানবাহন সবই শব্দহীন। ওদেশে কোলাহল একেবারে বারণ।'

'কেন দাদু? কোলাহল কী মানুষের ক্ষতি করে?' প্রশ্নবান ছুঁড়ে দিল বীরু।

দাদু হুংকার দিয়ে বললেন, 'আলবাৎ। পঁয়তাল্লিশ ডেসিবেলের বেশী শব্দ মানুষের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার হেরফের ঘটায়। একে বলে শব্দদূষণ। এর প্রতিক্রিয়ায় শ্রবণশক্তি কমে যায়। এমন-কি মানুষ বধির হতে পারে। তাছাড়া মাথাধরা, মানসিক অবসাদ, বদহজম, অসহিষ্ণুতা, কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া, একাগ্রতা নষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। রক্তচাপের আধিক্য, হৃদ্‌রোগ, গ্যাসট্রিক আলসার, স্নায়ুবিকার প্রভৃতির কবলে পড়ে মানুষ চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়ে।'

'শব্দদূষণ থেকে বাঁচার উপায় কী?'—হীরু জিগ্যেস করল।

দাদু গম্ভীর স্বরে বললেন: 'শব্দ-দৈত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। চাই উপযুক্ত আইন ও তার যথাযথ প্রয়োগ। শব্দদূষণের

বিরুদ্ধে চাই সামাজিক প্রতিরোধ। এর কুফল সম্বন্ধে ব্যাপক গণশিক্ষা দিতে হবে। যন্ত্রপাতি থেকে যাতে কমমাত্রায় শব্দ বের হয় প্রযুক্তিভাবে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘরবাড়ি হবে শব্দ-নিয়ন্ত্রিত (সাউণ্ড প্রুফ)। উচ্চ কম্পাঙ্কযুক্ত শব্দ শোষণের জন্য দরকার অর্জুন, শিশু প্রভৃতি উদ্ভিদের চাষ।'

দাদু একটু জিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা-দীক্ষা অর্থনীতি প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে ওদেশের মানুষ পেয়েছে বাঁচার প্রতিশ্রুতি। এক-কথায় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ওরা পৃথিবীবাসীর চেয়ে অনেক এগিয়ে।

মোটামুটি সবকিছু দেখে নিলাম। এবার ঘরে ফেরার পালা। সেদিন গ্রহবাসী সকলে নববর্ষের অনুষ্ঠানে উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনায় ডুবুডুবু। এই সুযোগে আমরা যানে চড়ে চুপিচুপি পৃথিবীতে পালিয়ে এলাম।'

'চুপিচুপি কেন?'—বিস্ময়-ঝরা গলায় প্রশ্ন করল বীরু।

'আমাদের পিছু পিছু হয়তো ওরা পৃথিবীতে হাজির হতো।'

'তাতে ক্ষতি কী?'—অধৈর্য-মুখে জিগোস করল হীরু।

'ক্ষতি! বিরাট ক্ষতি। ওরা পৃথিবী আক্রমণ করতে পারে।'

'আক্রমণ করবে কেন?'

দাদু মুচকি হেসে বললেন, 'সেটাই তো স্বাভাবিক। প্রথমে ওরা আসবে বন্ধুত্বের মুখোশ পরে। পৃথিবীর প্রাচুর্য দেখে তারপর আসবে রোজগারের ধান্দায়। যখন বুঝতে পারবে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ওদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে, তখন আসবে রাজত্ব করতে। একটি উন্নত ক্ষমতাশালী জাতি অনুন্নত দুর্বল জাতিকে নিপীড়ন-শোষণ করবে—এটাই তো জগতের নিয়ম।

'দাদু, ভাগ্যিস ততদিন আমরা থাকব না।'—ওরা বলল।

সিন্ধু পারের পাখি

পোষ মাস। দাদু রয়েছেন ভেতর-বাড়িতে। বৈঠকখানায় বসে আছে বীরু আর হীরু। হঠাৎ তারা নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি জুড়ে দিল।

'পাখি কখনো কথা বলতে পারে? যত্তো সব আজগবি গপ্প।'—হীরু তাচ্ছিল্যভাবে বলল।

'আহা! কী আমার পক্ষি-বিশারদ রে। কেন টিয়া-তোতা কথা বলে না?' ব্যঙ্গে বলল বীরু।

'সে হলো আলাদা কথা। ওরা শেখানো বুলি আওড়ায়। ধর্ম সম্বন্ধে এ-রকম জটিল প্রশ্ন কোন পাখি করতে পারে? কক্ষনো না।'—হীরু জোর গলায় বলল।

'চুপ-চুপ। দাদু আসছে।'—চাপা স্বরে বলল বীরু।

'কী কথা হচ্ছিল রে?' আদুরে গলায় জিগেস করলেন দাদু।

'মহাভারতের ঐ আজগবি গপ্পটা।' হীরু নিচু গলায় বলল।

'কী গপ্প? শুনি।'

হীরু তড়বড় করে বলতে শুরু করল:

'একদা জল-পিপাসায় কাতর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জল আনতে পাঠালেন ছোট ভাই নকুলকে। নকুল কাছাকাছি একটা সরোবরের তীরে পৌঁছে শুনতে পেলেন এক কণ্ঠস্বর—'বৎস আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও, পরে জলপান করো।' নকুল এ-দিক ও-দিক তাকালেন; কিন্তু নিষেধকারীকে দেখতে পেলেন না। পিপাসায় তখন তাঁর ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তাই নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করে তিনি জলপান করলেন। অমনি তাঁর মৃত্যু ঘটল। তারপর একে একে সহদেব, অর্জুন আর ভীমসেন এলেন জল নিতে। সবাইকে ঐ এক কথা। কেউ আর নিষেধকারীকে আমল দিলেন না। জল-পানে সকলেরই মৃত্যু হলো। শেষে এলেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং। তিনি গাছের ডালে দেখতে পেলেন এক, বিরাট আকৃতির বক। পাখিটি তাঁকে ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি চোখা চোখা প্রশ্ন করলেন। যুধিষ্ঠির সব কটারই ঠিকঠাক উত্তর দিলেন।'

গপ্পটা শেষ করে হীরু একটু থামলো। বুদ্ধিদীপ্ত মুখে জিগেস করল, 'পাখি কী মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে?'

শুনে, দাদু চোখ জোড়া বুজলেন। খানিক গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন। তারপর গায়ের কম্বলটা দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এটা কিসের তৈরী, বলতে পারিস?'

'ভেড়ার লোম।'—বীরুর চটপট জবাব।

দাদু বড়গোছের একটা হাই তুলে বললেন, 'হুঁ। তবে যে-সে ভেড়ার না। মেরিনো মেষের।'

'কোত্থেকে কিনলে দাদু?'—ছটফটে গলায় জিগ্যেস করল বীরু।

'মেলবোর্ণ থেকে। ডার্লিং ডাউনস্ এর নাম শুনেছিস?'

'হ্যাঁ। কুইন্সল্যাণ্ডে। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত মেষপালন ক্ষেত্র। তুমি ওখানে গেছিলে বুঝি?'

দাদু অল্প করে ঘাড় নাড়লেন, যার অর্থ হলো 'হ্যাঁ'। বললেন, 'ফিরে এলাম এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে।'

'কী অভিজ্ঞতা, দাদু?' বীরু-হীরু আগ্রহ প্রকাশ করল।

স্মৃতির ঝুলি খুলে দাদু বলতে শুরু করলেন:

'ডিসেম্বর মাস। আবহাওয়া গরম আর প্যাচপ্যাচে ভাব। অস্ট্রেলিয়াবাসী সেদিন বড়দিনের খুশিতে বেসামাল। মিতু পৌঁছাল মেলবোর্ণ। নিজের কাজে। সংগে আমিও।

মেলবোর্ণ বেশ গমগমে শহর। অধিবাসীর জীবনযাত্রা কতকটা ইংরেজদের রীতিনীতির ধারঘেঁষা। যা হোক। আমরা উঠলাম একটা হোটেলে। বেশ ছিমছাম। ব্যয়বহুল না। পরিষ্কার সাজানো-গোছানো। ঘরের দেয়ালে টাঙানো গোটা তিনেক ছবি। বড় সাইজের। বাঁধানো। ভারি সুন্দর। মাঝে নদী—বেশ গতর দুলিয়ে এঁকেবেঁকে বইছে। দু'পাড় উঁচু। ঘাস আর ছোট ছোট তৃণ-গুল্মের টসটসে সবুজ চাদরে মোড়া। ছোট-বড় গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধত ভঙ্গিতে। গাছে গাছে রঙ-বেরঙের পাখি। তলায় মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ওয়ালাবি—ছোট জাতের কাঙারু। দেখতে বড় কুকুরের মতো। মাঝে উপত্যকার চারদিকে গমক্ষেত। মারে-ডার্লিং নদীর দো-আবে (বেসিন) চরছে মেরিনো ভেড়া। সব মিলিয়ে অপূর্ব চোখ-জুড়ানো এক প্রাকৃতিক দৃশ্য। তাই দেখে মারে নদীর তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলাম।

সারাটা দিন মিতু থাকতো হোটেলের বাইরে কাজের তাগিদে। একা একা কী আর করবো? ধ্যানের চোখে দেখতাম মারে নদী আর তার

চারপাশটা। বিকেলের দিকে বাইরে বেরিয়ে পড়তাম নিছক বেড়ানোর আনন্দে। অচেনা-অজানা পথচারীর সংগে আলাপ হোত। প্রথম প্রথম খুব অসুবিধে হোত ভাষা নিয়ে। ওদের ইংরেজি উচ্চারণে একটা বিশ্রী টান। বোঝা মুশকিল।

মারে নদীর সম্বন্ধে নানারকম গপ্প শুনতাম ওদের কাছে। কল্পনার ডানায় ভর করে সেখানে উড়ে যেতাম। শুধু মিতুর জন্যে ওখানে যাওয়া হলো না। আপসোস হোত।

ভাগ্যক্রমে একদিন সুযোগ মিলে গেল। সেদিন সংবাদপত্রের শিরো-নামায় স্থান পেয়েছে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ: মারে নদীর ধারে পাথর খুঁড়ে পাওয়া গেছে গোটাকতক খুরহীন ঘোড়ার ফসিল। ব্যস্, মিতুর গবেষণা-পাগল মন উঠল চাগড় দিয়ে। তল্পি-তল্পা নিয়ে ছুটলাম সেখানে।

নদীর ধারে একটা পাহাড়ি জায়গা। সেখানে সাজানো রয়েছে ফসিলগুলো। তখনও পাথর কাটার কাজ চলছে। ফসিলগুলো একনজরে দেখে নিলাম। সাইজে দেশী কুকুরের মতো। মিতু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল অনেকক্ষণ ধরে। পাথরের নমুনা নিল। ফটো তুললো। পরীক্ষা শেষে মিতু বলল, 'চ' জায়গাটা ঘুরেফিরে দেখে নিই।'

নদীর ধারে একটা সরু রাস্তা। তত মসৃণ না। চারপাশে নজর ফেলতে ফেলতে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। নদী তখন জলে টৈটুম্বর। তুষারগলা জল। স্বচ্ছ। তরতর করে বয়ে যাচ্ছে। ঝলমলে রোদ পড়ে চকচক করছে। রুপোলি জলে ছোট ছোট মাছ। রাস্তার ধারে চেনা-অচেনা গাছপালা। ইউক্যালিপটাস, জারি, কারা প্রভৃতি গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। জায়গাটা নির্জন আর প্রগাঢ় শান্তিতে ঘেরা। বুঝি কাঠ-চোরদের উপদ্রব শুরু হয়নি। গাছে গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুগার গ্লাইডার নামে এক শ্রেণীর প্রাণী। ডালে ডালে সাদা-কালোয় মেশানো ম্যাগপি পাখি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লাল ও ধূসর রঙের কয়েকটা কাঙারু আমাদের দেখে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। তা হবে পাঁচ-ছ ফিট লম্বা। অদূরে গমক্ষেত। সূর্যের রশ্মি তেরছা হয়ে পড়ছে। সে এক অপরূপ দৃশ্য, যেন একটা আঁকা ছবি। আমরা নিবিষ্টমনে সব দেখতে দেখতে চলেছি। অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনটাকে ভরিয়ে দিল প্রাপ্তির আনন্দে।

যেতে যেতে মিতু বললো, 'দ্যাখ্ ফসিল দেখে মনে হচ্ছে—আধুনিক ঘোড়ার প্রপিতামহ।' ঘোড়ার ক্রম-বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে

ক্রমে আমরা একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আচমকা শুনতে পেলাম গরুর ডাক—হাম্বা হাম্বা। বুঝলাম নিকটে গরু চরছে। সামনে আর একটু এগোতেই ভেসে এলো কচি শিশুর অস্পষ্ট কান্নার আওয়াজ—ট্যাঁ-ট্যাঁ। পরক্ষণে নারীকণ্ঠে কান্নার শব্দ। থমকে দাঁড়ালাম। কান খাড়া করে খানিক শুনলাম। শব্দ স্পষ্ট। বুঝলাম, জঙ্গলের মধ্যে শিশুসহ কোন মহিলা বিপদগ্রস্ত। চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললাম। নাঃ, কিছুই নজরে পড়ল না। অগত্যা আমরা জোর কদমে পা চালালাম। শব্দ থেমে গেল। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। এদিক-ওদিকে তাকাতে লাগলাম। নাঃ, কিছুই দেখা গেল না। তারপর পশুর চাপা গর্জন শুনে আমরা চমকে উঠলাম। বিপদের আশঙ্কা। মিতুকে বললাম, 'চ' ফিরে যাই।'

ফিরবো বলে যেই পা বাড়িয়েছি, শুনতে পেলাম মোটর-সাইকেলের ফটফটানি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থেমে গেলাম। মিতুকে বললাম, 'চল তাড়াতাড়ি। নির্ঘাত মৃত্যুর হাতছানি।'

মিতু কিন্তু নির্ভয়। সে খানিক ভেবে নিয়ে বলল, 'নাঃ, রহস্যের কিনারা না করে ফিরবো না।' আমি চুপ মেরে গেলাম।

অগত্যা মিতুকে যন্ত্রবৎ অনুসরণ করতে লাগলাম। চারদিকে আমার সতর্ক দৃষ্টি। বুকের ভেতরটা তখন টিপটিপ করছে। শত চেষ্টা করেও ভয়-ভয় ভাবটা কাটাতে পারলাম না। ইস্, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে এসে মিছিমিছি কী ঝামেলা!

ইতিমধ্যে ফটফটানি শব্দ থেমে গেছে। ভেসে এলো ডানা-ঝাপটানির শব্দ। মিতু থমকে দাঁড়াল। তার ইসারায় একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। মিতুর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ঝিলিক দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

অদূরে তাক-লাগানো দৃশ্য। পরিষ্কার তকতকে একটা জায়গা। আলো-ছায়াময়। সেখানে গোটা চারেক পাখি পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। পাগুলো লম্বা, বেশ পুষ্ট। ঠোঁট টুকটুকে লাল। মনে হলো পোকা-মাকড় বের করে খাচ্ছে। পালকের বাহারি রঙ দেখে আমরা মুগ্ধ। লেজ কী সুন্দর! বীণার মতো। মাটি খোঁড়ার সময় গায়ে ধুলো লাগছে। তাই সাফ করার জন্যে মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটাচ্ছে। আমরা গভীর মনোযোগের সংগে পাখিগুলোর ক্রিয়াকাণ্ড লক্ষ্য করছি। হঠাৎ আমাদের বিস্মিত করে একটা পাখি মানুষের মতো হেসে উঠল হাঃ হাঃ হিহি।

বলতে পারিস ঐ পাখির নাম? দাদু আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

বীরু ইতস্তত করে বলল, 'লেজটা বীণার মতো। লায়ার বলে হয় না, দাদু?'

'বাঃ বাঃ। ঠিক বলেছিস। ওদেশে বলে লোয়ার। পাখির জগতে রহস্যময়।

'পাখিরা এমন নকল বিশারদ হতে পারে; খুব অদ্ভুত ব্যাপার তো!' —বীরুর গলায় বিস্ময় ঝরে পড়ল।

দাদু ঠোঁটে অদৃশ্য এক হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'শুধু কী তাই? সুন্দর গান গাইতে পারে। গান শুনে শিকারির বন্দুকও হাত থেকে খসে পড়ে। মহাভারতের ঐ বক আসলে লোয়ার-পাখির মতো নকল-বিশারদ ছিল। এরকম পাখি আর রয়েছে কুমেরু দ্বীপে। নাম হলো পেঙ্গুইন। বেশ শান্ত ও ভদ্র প্রকৃতির। মানুষের ভাষায় সুন্দর গান গাইতে পারে। ডঃ সেলিম আলী একজন মস্ত পক্ষি-বিশারদ। পাখির ওপর অনেক বই লিখেছেন তিনি। পারিস তো তাঁর বইগুলো পড়ে দেখিস—'

লঙ্কা-রহস্য

'হীরু—'

'কিছু বলছো দাদু?'

'মাথাটা ক'দিন ধরে ঘুরছে। তোর বাবাকে বলিস তো প্রেসারটা দেখে যেতে।'

'বাবা তো বাড়ি নেই, দাদু।'

'কোথায় গেছেন?'

'রাবণের দেশে।' মুখে চাপল্যের হাসি টেনে বললো হীরু।

'কী বললি? রাবণের দেশে! রাবণের দেশ কোথায় জানিস?' দাদু হুংকার ছাড়লেন।

'লঙ্কা, মানে সিংহল।' হীরু ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল।

'সিংহলই যে লঙ্কা—একথা কে বলেছে?' দাদুর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা ফুটে উঠল।

'তাইতো সবাই বলে।' হীরু নিচুগলায় বলল।

দাদু একটু ক্ষোভের সংগে বললেন, 'তোদের আর দোষ কী? গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাটাই রাজনৈতিক শিকারীর খপ্পরে পড়ে আজ বিপর্যস্ত। সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।'

'তবে লঙ্কা কোথায়?' বীরু-হীরু কৌতূহলী চোখে তাকাল।

দাদু উদাস হয়ে গেলেন। বললেন, 'কী হবে জেনে? সত্য এখন তামাদি হয়ে গেছে মিথ্যের অভিধানে।'

বীরু-হীরু কিন্তু নাছোড়।

অগত্যা দাদু ঈষৎ হেসে শান্ত গলায় বললেন, 'লঙ্কার সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান আবিষ্কার করতে হলে আগে তৎকালীন সভ্যতার উপর আলোকপাত দরকার। তাহলে চুপ করে শোন্।'

দাদু বলতে লাগলেন, 'পৃথিবীর বুকে যে তিনটি প্রাচীন সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল তা হলো—সুমের বা মেসোপটেমিয়া, মিশর আর ভারতের সিন্ধু সভ্যতা।' দাদু একটু থামলেন। এক ঢোঁক জল খেয়ে ফের বলতে শুরু করলেন:

'প্রথমে সুমের সভ্যতার কথা বলা যাক। অতীতে এক বিশাল

বিস্তৃত ভূখণ্ড ভারতবর্ষ আর আফ্রিকার সংগে সংলগ্ন ছিল। এই ভূখণ্ডের নাম লেমুরিয়া। এই লেমুরিয়াতেই গড়ে ওঠে সুমের সভ্যতা। এই সভ্যতার রূপকারেরা ছিল উন্নত লিপির অধিকারী। মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন রকমের স্তম্ভ, অর্ধস্তম্ভ, খিলান, আর জিগগুরাতের মতো শিল্পমণ্ডিত বিরাট বিরাট মন্দির চোখে লাগার মতো। সুমেরীয় ভাস্করেরা যে তৈরী করতো বড় আকারের তামার ও চুণাপাথরের মূর্তি তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ধাতুশিল্পে কারিগরী দক্ষতার পরিচয় মেলে সোনার গড়া পরচুলা শিরস্ত্রাণ, বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও বাসন-পত্রাদির নির্মাণ কুশলতা থেকে। সুমেরীয় শিল্পকলার উচ্চাঙ্গ নিদর্শন হলো নালিক সীল। এটি ব্যবহার করতেন মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা বাণিজ্যিক সংস্থা এমন-কি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞানরূপে। তাঁদের মধ্যে লিঙ্গ ও যোনিপূজার প্রচলন ছিল। তাঁরা যে শিবপূজা করতেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে আবিষ্কৃত তিনটি সীল থেকে। তিনটিতেই খোদিত রয়েছে যোগ-সাধনারত শিবের মূর্তি।'

দাদু ওদের মুখের দিকে তাকালেন। 'বুঝতে পারছিস ?'

হীরু ঘাড় নাড়ল বটে কিন্তু বীরু মাথা চুলকাতে লাগল। দাদু বললেন, 'ইতিহাসে এসব তোরা পাবি। একটু নিরস, বীরু মাথা চুলকাচ্ছে, ওরে এর মধ্যেও রসকস আছে। শোন, এবার সিন্ধুসভ্যতার কথা সংক্ষেপে বলি :

সিন্ধুসভ্যতা মাত্র মহেঞ্জোদারোতেই বিকশিত হয়নি। এর বিকাশ ঘটে পনেরো লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী এক বিস্তৃত এলাকায়। সিন্ধুসভ্যতা হচ্ছে তাম্রাশ্ম বা ক্যাল্‌কোলিথিক (oalcolithic) সভ্যতা। এই সভ্যতার ধারকরা অস্ত্রশস্ত্র ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈরী করতো তামা আর পাথর দিয়ে ; তাই এর নাম তাম্রাশ্ম সভ্যতা। অধিবাসীদের মধ্যে ভাষার রূপদানের জন্য লিখন-প্রণালীর প্রচলন ছিল। সিন্ধুলিপি পাওয়া গেছে দু'রকম প্রত্নবস্তুর ওপর—(১) নরম পাথরের তৈরী সীলমোহরের এক পিঠেই খোদিত আছে লিখন,—শীর্ষদেশে আছে একছত্র লিপি ও নিম্নদেশে খোদাই করা আছে এক পশুর চিত্র। (২) তামার পাতগুলির সামনের দিকে আঁকা আছে লিপি আর পিছন পিঠে পশুর চিত্র। সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে পয়ঃপ্রণালী ও পোতাশ্রয় আবিষ্কৃত হয়েছে। অধিবাসীদের অঙ্গসাজের জন্য ছিল সোনা, রূপা, শঙ্খ ও মূল্যবান পাথরের নানারূপ অলংকার। সূর্যপূজার যে প্রচলন ছিল তা বোঝা যায় সীলমোহরের ওপর চক্র ও স্বস্তিক চিহ্ন থেকে। এগুলি

সূর্যের প্রতীক। বৈদিক আর্যদের মধ্যে এ-পূজার প্রচলন ছিল। তবে তাঁরা সূর্যকে নরের আকারে পূজা করতেন।'

হীরু বলল, 'এসব পুজো কোথায় হতো ?'

দাদু বললেন, 'দেবস্থানে। উর্ধ্বলিঙ্গ শিব ও মাতৃকাদেবীর পুজো হতো। জানিস, সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের যে পাটিগণিত, দশমিক গণন ও জ্যামিতিতে বিশেষ জ্ঞান ছিল তার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদারোয় পাওয়া প্রত্নের বস্তুগুলোতে। সিন্ধুসভ্যতা যে শিক্ষিত সাক্ষর-সমাজের সভ্যতা তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

দাদু থামছিলেন আর চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছিলেন ক্ষুদে-শ্রোতারা উসখুস করছে কিনা। তারা বেশ মনোযোগী বুঝে তিনি আবার শুরু করলেন :

'সুমের সভ্যতার সংগে সিন্ধু সভ্যতার যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণনাথ এক নিবন্ধে বলেন,—সুমেরীয় ও সিন্ধু সভ্যতা অভিন্ন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সি. জে. গাড এক নিবন্ধে বলেছেন—প্রাচীন ইরাকের (সুমেরের) উর্ নগরে আবিষ্কৃত দশটি সীলের সংগে সিন্ধু উপত্যকার সীলগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সীলের ওপর খোদিত লিপিরও আশ্চর্য মিল। তবে সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার আজো সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি একদল সোভিয়েত-বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত হলো,—সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে পাওয়া সীলমোহরের ওপর যে লিপি খোদিত আছে তা দ্রাবিড় ভাষায় লেখা। সিন্ধু সভ্যতার অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে মেসোপটেমিয়া ও পারস্য উপসাগরে অবস্থিত বেহরিং দ্বীপে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত হলো—সিন্ধু সভ্যতা হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতার শাখা বা নিকট-জ্ঞাতি।'—এ-পর্যন্ত বলে দাদু একটু থামলেন। এই ফাঁকে হীরু জিজ্ঞেস করল, 'সুমেরের লোকেরা কোত্থেকে এলো ?'

কপাল কুঁচকে দাদু হীরুর দিকে তির্যগ তাকালেন। মিটিমিটি হেসে বললেন, 'প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হলের (Hall) মতে সুমেরের লোকেরা গিয়েছিল ভারত থেকে।'

শুনে হীরু প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'ভারতের কোথায়, দাদু ?' অসীম আগ্রহে সে জিজ্ঞেস করল।

দাদু ভেবে বললেন, অবিশ্বাস্য হলেও, সত্যি। ভারতের 'সৌমার' দেশ থেকে লোকজন গিয়ে ওখানে নোতুন উপনিবেশ গড়ে। 'সৌমা' থেকেই

'সুমের' শব্দের উৎপত্তি। যোগিনীতন্ত্রে উল্লেখ আছে যে—'সৌমার' দেশ ছিল পূর্ব ভারতে। অর্থাৎ সুমেরীয় সভ্যতা, বাঙালি সভ্যতা বলেই সন্দেহ হয়।*

'সিন্ধু ও আর্যসভ্যতা কী অভিন্ন?'—হঠাৎ প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল বীরু।

দাদু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তা কেন হবে? অনেক তফাৎ। (১) বড় প্রমাণ হলো, মৃৎপাত্র। কুরু-পাঞ্চাল দেশে যেখানে আর্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে, সেখানকার মৃৎপাত্রের রঙ ছিল ধূসর আর সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্র-সমূহে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের রঙ হলো 'কালো-লাল'। (২) সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষি-ভিত্তিক। আর্যরা তো প্রথমে কৃষিকার্য জানত না। (৩) সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা ছিল লিঙ্গ ও মাতৃকাদেবীর উপাসক। আর্যরা লিঙ্গ-উপাসকদের ঘৃণার চোখে দেখতো। (৪) সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের বাহক ছিল হাতি আর আর্যদের ছিল ঘোড়া। (৫) সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা ছিল নগরবাসী। আর আর্যরা নগর ধ্বংস করতো। (৬) সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা মৃতের সমাধি দিত আর আর্যরা মৃতব্যক্তি দাহ করতো। এ সব কথা এখন থাক। আসল কথায় ফিরে আসি।'

বীরু বলল, 'সেই ভাল।'

'শোন্। লেমুরিয়াতে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তা প্রধানত সুমের সভ্যতা। আর এর স্বরূপ হলো অনার্য দ্রাবিড় সভ্যতা।' দাদু খানিক থামলেন। চিরাচরিত হাসি হেসে জিগ্যেস করলেন, 'মালদ্বীপের নাম শুনেছিস?'

বীরু ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রায় ছশো কিমি দূরে, একটা দ্বীপ। প্রায় দু'হাজার ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপ নিয়ে গঠিত।'

দাদু সহাস্যে বললেন, 'হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ওর বর্তমান রাজধানী হলো মালে আর রাষ্ট্রভাষার নাম হচ্ছে দেভিহি। এখানে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে প্রায় চার হাজার বছর আগেকার জিনিস-পত্র। এগুলির মধ্যে আছে চুনাপাথরের তৈরী বড় বড় শিবলিঙ্গ অর্থাৎ এখানকার অধিবাসীরা ছিল লিঙ্গ উপাসক। বর্তমানে ওখানকার অধিকাংশ অধিবাসী হলো ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এদের আগে ওখানে বাস করতো বৌদ্ধরা। তাহলে শিবলিঙ্গ কোত্থেকে এলো? আর পাওয়া গেছে এক-ধরণের বড় বড় মন্দির—অনেকটা জিগ্‌গুরাতের মতো। মন্দিরের গায়ে

* অতুল সুর—বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন। পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬

খোদাই-করা চিত্রগুলি উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক। এখানে জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মন্দিরের গায়ে খোদাই-করা আছে সূর্যফুল। অর্থাৎ এখানকার অধিবাসীরা সূর্যেরও উপাসনা করতেন। এ-থেকে সহজে অনুমান করা যায়—মালদ্বীপে এককালে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তা সুমের সভ্যতা। আবার মালদ্বীপে যে শিলালিপির খোঁজ পাওয়া গেছে, তার সংগে সাদৃশ্য রয়েছে সিন্ধু-শিলালিপির। এ-থেকে প্রমাণিত হচ্ছে মাল-দ্বীপে একসময় দ্রাবিড়-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।'

দাদু চশমা খুলে মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, 'তোদের ইস্টার দ্বীপের সংগে পরিচয় আছে?'

'ওশানিয়ার দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে পূর্ব-প্রশান্ত মহাসাগরে একটি ছোট দ্বীপ। লোকসংখ্যা এক হাজার। গ্রামও একটি—হাঙ্গা রোয়া।'—হীরু জবাব দিল।

শুনে দাদুর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'বেশ। বেশ। এই ইস্টার দ্বীপের লিপির সংগে সিন্ধুলিপির অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্বে মালাগাসি বলে একটি দ্বীপ আছে। এখানকার ভাষার সংগে ইস্টার দ্বীপের ভাষার আশ্চর্য মিল। তাহলে মালাগাসির ভাষার সংগে সুদূর মালদ্বীপের ভাষার একটা পরোক্ষ সম্পর্ক পাচ্ছি. তাই না?'

বীরু ঘাড় নেড়ে বলল, 'তাজ্জব ব্যাপার তো।'

দাদু আবার তাঁর কথার খেই ধরলেন, 'এই মালাগাসির ভাষার সংগে স্বাভাবিকভাবে নিকটবর্তী আফ্রিকা মহাদেশের ভাষার মিল থাকা উচিত ছিল। অথচ তা নেই।'

'এ-রকম ঘটার কারণ কী?'—হীরু কৌতূহলী গলায় জিগ্যেস করল।

দাদু উত্তর দিলেন, 'ভূমিকম্প বা অন্য কোন নৈসর্গিক কারণে লেমুরিয়া ভারত মহাসাগরে ডুবে যায়। এই বিরাট ভূখণ্ডের কিছু কিছু অংশ এখনও জেগে আছে—যেমন মালদ্বীপ. লাক্ষাদ্বীপ, মালাগাসি ইত্যাদি। লেমুরিয়া ডুবতে আরম্ভ করলে অধিবাসীরা ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ভারত, গুজরাট, দক্ষিণ আমেরিকা, ইস্টাব দ্বীপ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে। আগেই বলেছি, লেমুরিয়াতে যে সভ্যতার বিকাশ হয় তা আসলে দ্রাবিড় সভ্যতা। লেমুরিয়া ডুবতে শুরু করলে উন্নত দ্রাবিড়রাই দেশান্তরে গমন করেছিল।'

দাদু না থেমে বলে চললেন, 'এবার স্বর্ণালঙ্কার প্রসঙ্গে আসি। রামায়ণে সুবর্ণপুরী লঙ্কার যে বর্ণনা আছে, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়

স্থাপত্য শিল্পে ও ঐশ্বর্যে লঙ্কা ছিল তৎকালীন এক অপূর্ব বিস্ময়। সেখানে বাস করতেন এক সমৃদ্ধশালী সুসভ্য জাতি। এই সভ্যতার কর্ণধার ছিলেন রাবণ। রামায়ণে আরো উল্লেখ আছে,—লঙ্কাধীশ রাবণ সর্বদা বহন করতেন একটি স্বর্ণ লিঙ্গ। অর্থাৎ তিনি ছিলেন লিঙ্গ-উপাসক। এ-থেকে প্রমাণিত হয় রাবণ ছিলেন অনার্য। আর্যরা অনার্যদের ঘৃণার চোখে দেখতেন। রাবণকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যই আর্য-ঋষি বাল্মীকি তাঁকে রাক্ষস্ বানিয়েছেন।'

দাদুর কথায় বাধা দিয়ে হীরু বলল, 'রাক্ষস যদি না হবে তবে তাঁর দশটা মাথা আর বিশটা হাত কেন?'

দাদু হাসলেন। বললেন, 'ঠিকই তো। রাবণেব দশটা মাথা আর বিশটা হাত কেন? তবে শোন্। রাবণ একজন সুসভ্য মানুষ।

দক্ষ যোদ্ধা হিসেবে রাবণ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ঐশ্বর্য অনেক দেশেরই ঈর্ষার কারণ। কুশাগ্র বুদ্ধি ছিল তাঁর। তাঁর অতুলনীয় শৌর্য-বীর্য, বিরাট ব্যক্তিত্ব আর দৃপ্ত পৌরুষকে আড়াল করবার জন্যই বাল্মীকি ও রকম বলেছেন।'

'তাহলে লঙ্কা কোথায় ছিল?'—বীরু-হীরু অসীম আগ্রহে জিগ্যেস করল।

দাদু প্রসন্ন গলায় বললেন, 'হ্যাঁ সে-কথায় আসছি। রাবণ ছিলেন সুমের অর্থাৎ দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাণপুরুষ। দ্রাবিড়-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হলো এই লঙ্কা। লঙ্কা ছিল লেমুরিয়ার কোন এক স্থানে।' দাদু একটু থামলেন। তাঁর মুখে আলগা হাসির ছোঁয়া। আড়চোখে তিনি পরখ করলেন বীরুর মতিগতি। জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা বীরু বলত মধ্যরেখা কাকে বলে?'

সপ্রতিভভাবে বীরু জবাব দিল, 'সুমেরু ও কুমেরু বিন্দুকে সংযোগ করা হয়েছে কতকগুলি কাল্পনিক রেখা দিয়ে প্রতি ১° অন্তর। এগুলিকে বলে দ্রাঘিমা রেখা। এদের একটি গেছে গ্রীণিচ শহরের পাশ দিয়ে। এখানকার মান ধরা হয়েছে 0°। এটিকে বলে মধ্যরেখা।'

দাদু মুচকি হেসে বললেন, 'বেশ। এরকম একটি মধ্যরেখার উল্লেখ আছে সূর্যসিদ্ধান্তে[২]। 'লঙ্কা ও সুমেরু পর্বতের (North pole of the

---

২ রাক্ষসালয়দেবৌকঃ শৈলয়োর্মধ্যসূত্রগাঃ।
রোহীতকমবন্তী চ যথা সন্নিহিতং সরঃ॥—সূর্যসিদ্ধান্ত ১।৬২

earth) সম-সূত্রপাতে যে রেখা কল্পিত হয়—ইহার নাম মধ্যরেখা। ঐ রেখাতে রোহিতক নগর, উজ্জয়িনী এবং কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি দেশ সকল অবস্থিত আছে।' রোহিতক নগর হচ্ছে হরিয়ানার রোহটক শহর, উজ্জয়িনী মধ্য-প্রদেশের একটি শহর, আর মহাভারতের কুরুক্ষেত্র হচ্ছে বর্তমান পাঞ্জাবের আম্বালা ও কর্ণাল জেলার থানেশ্বর ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল। সূর্যসিদ্ধান্তে আরো আছে—লঙ্কা নিরক্ষবৃত্তে অবস্থিত। নিরক্ষবৃত্ত মানে বিষুবরেখা। এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে, মধ্যরেখা যেখানে বিষুবরেখাকে ছেদ করেছে সেখানেই এককালে ছিল লঙ্কা।'

দাদু মানচিত্র খুলে নিজেই কুরুক্ষেত্র, রোহটক আর উজ্জয়িনী—এই তিনটি স্থানকে একটি সরলরেখার সাহায্যে যুক্ত করলেন। রেখাটিকে উত্তর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। উহা সুমেরু বা উত্তরমেরু অঞ্চল স্পর্শ করল। রেখাটিকে তিনি আবার দক্ষিণে বাড়িয়ে দিলেন। উহা বিষুবরেখাকে ছেদ করল। ঠিক মালদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রায় তিনশো মাইল দূরে। দাদু সহাস্যে বললেন, 'এইখানেই ছিল লঙ্কা—ভারত থেকে এর দূরত্ব হবে প্রায় নশো মাইল।'

দাদু একটু থেমে ফের বলতে শুরু করলেন: 'রামায়ণে উল্লেখ আছে, হনুমানকে লঙ্কা পৌঁছুতে শত যোজন পাড়ি দিতে হয়েছিল'। এক যোজন হল আট মাইলের কিছু বেশী। তাহলে বাল্মীকি বেঠিক কিছু বলেন নি। আর সিংহল হল ভারত থেকে মাত্র তেত্রিশ মাইল দূরে। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে সিংহল লঙ্কা নয়।'

'নশো মাইল এক লাফে পাড়ি দেওয়া কী একটা বাঁদরের পক্ষে সম্ভব?'—আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল হীরু।

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে দাদু পুলকিত বিস্ময়ে হীরুর দিকে দুদণ্ড তাকালেন। ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে তিনি বললেন, 'হনুমান বাঁদর ছিলেন না রে। বৈজ্ঞানিক আলোকপ্রাপ্ত সুসভ্য মানুষ। তবে ঐ একটা দোষ—অনার্য। তাই বাল্মীকি তাঁকে বাঁদর সাজিয়েছেন। আর লাফ দিয়ে এতখানি পথ পার হওয়া অসম্ভব। মনে হয় তিনি হেলিকপ্টার জাতীয় কোন যান ব্যবহার করেছিলেন।'

'সিংহল যে লঙ্কা নয়—আর কী কোন প্রমাণ আছে?'—বীরু জিগোস করল।

দাদু অল্প হেসে বললেন, 'আছে বৈকি। মহাভারতের সভাপর্বে[৩] আছে—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ইন্দ্রপ্রস্থে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন সিংহল ও দ্রাবিড় দেশের রাজারা। সিংহল, দ্রাবিড় দেশ হলে এ-দুটো দেশের নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করার কী দরকার ছিল? আগেই বলেছি দ্রাবিড় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল লঙ্কা।

তাছাড়া মিতু ভারত মহাসাগরের ঐ স্থানে অনেকদিন ধরে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। আলট্রাসনিক ওয়েভ দিয়ে জাহাজ থেকে সমুদ্রের গভীরতা মেপেছিল। ঐ এলাকা ততটা গভীর না। মাত্র ছ-সাতশো ফুট। সমুদ্রের অন্য অংশের তুলনায় এখানকার গভীরতা এত কম কেন? তলদেশে নিশ্চয়ই কোন লুপ্ত দেশ আছে।'

'দাদু, সমুদ্রের গভীরতা কীভাবে মাপা হয়?'—বীরুর জিজ্ঞাসা।

'জাহাজ থেকে জলের ভেতর শব্দ পাঠান হয়। শব্দ সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে উৎপত্তিস্থলে। হাইড্রোফোনে প্রতিধ্বনি ধরা পড়ে। শব্দ পাঠান আর প্রতিধ্বনি ফিরে আসার মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাপা হয় বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে। সাগরজলে শব্দের গতিবেগ হলো ১৪৫০ মিটার / সেকেণ্ড। সময় ও গতিবেগ জানা থাকলে গভীরতা সহজে বের করা যায়।'

'আলট্রাসনিক ওয়েভ কাকে বলে?'—হীরুর প্রশ্ন।

দাদু সহাস্যে বললেন, 'এটাকে তোরা 'শব্দহীন শব্দ' বলতে পারিস। শব্দ বাতাসের ভেতর দিয়ে উৎপত্তিস্থল থেকে তরঙ্গাকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন পুকুরের জলে, ঢিল ফেললে ঢেউ ওঠে, তেমনি। শব্দের আন্তর্জাতিক মাপ কাঠিকে বলে ডেসিবেল (Decibel)। সাধারণতঃ কুড়ি থেকে কুড়ি হাজারের মধ্যে কম্পনযুক্ত শব্দগুলো আমরা শুনতে পাই। বাকি শব্দগুলো আমরা শুনতে পাই না। এ-সব শব্দতরঙ্গকে বলে আলট্রাসনিক ওয়েভ। এগুলো মাপার যন্ত্রকে বলে রেডিওমিটার।'

'লঙ্কা কবে জলে ডুবে গেল?'—প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল বীরু।

বিদঘুটে প্রশ্ন। দাদু বীরুর দিকে তাকালেন। ভুরু কুঁচকে উঠল। বললেন, 'ভাবনায় ফেললিরে।

তা কী বলা যায়? তবে লঙ্কা ৩১০২.বি, সি পর্যন্ত জেগে ছিল। সূর্যসিদ্ধান্তে আছে—'বেলি প্রভৃতি সাহেব গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে,

---

৩ কালীপ্রসন্ন সিংহ—মহাভারত, সভাপর্ব পৃষ্ঠা ৩০

৩১০২ বি. সি. ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে। সূর্য তখন লঙ্কার মাধ্যাহ্নিকে ছিল।' এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে—৩১০২ বি. সি.-র পর কোন এক সময় লঙ্কা জলে ডুবতে শুরু করে।'

'সিংহল যে লঙ্কা নয়—একথা কী সবাই জানে?'—হীরুর মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে এলো।

সবাই না হলেও, জানে অনেকেই। দাদু মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

'তবে কেন সিংহলকে লঙ্কা বলে চালান হচ্ছে? আসল কথা কেন চাপা দেওয়া হচ্ছে? কেন?'—উত্তেজিতভাবে জিগেস করল হীরু।

'মানে আঘাত লাগবে রে। একটি ঐতিহাসিক আভিজাত্য, ঐতিহ্য ও সম্মানের অধিকারী হওয়া কী কম কথা? তাই একদল স্বার্থান্বেষী সত্য প্রচারে বাধা দিচ্ছে।' রীতিমত ক্ষুব্ধ গলায় বললেন দাদু।

'আমরাও এ-সব জানতাম না, দাদু'। হীরু-বীরু একসঙ্গে বলল।

'এখন জানলি তো? তোদের ওপরই ভার রইল, তোরা এই সত্য প্রচার করবি। মানুষের ভুল ভাঙা দরকার। করবি তো?'

ওরা ঘাড় নাড়ল একসঙ্গে।

রাস্তা ধাক্কা দিচ্ছে

'পৃথিবী কী রথের চাকা গ্রাস করতে পারে?'

'কী সব আজেবাজে বকছিস?' বীরুর প্রশ্ন শুনে দাদু ধমকে উঠলেন।

'আজেবাজে না, দাদু। দিদাই তো বলেছে—সবার রথ চলছে গড় গড় ক'রে অথচ মহাবীর কর্ণের রথ গেল আটকে।'

'ওহ্ হ্। কর্ণার্জুনের লড়াই। ওরকম তো আকছার ঘটছে রে।'

'কই, আমার তো দেখি না।'

'দেখবার মতো চোখ চাই। আচ্ছা বল, রথ কী ক'রে চলে?— দাদু এবার গম্ভীর।

প্রশ্নটা সোজা মনে করে বীরু ঠোঁটের কোণা মুচড়ে বলল, 'ঘোড়ার টানে।'

'ঘোড়ার ডিম! কিচ্ছু জানিস না। রথ চলে রাস্তার ধাক্কা খেয়ে'। দাদু হো হো হো করে হেসে উঠলেন।

তিনি ফের প্রশ্ন করলেন, 'ধর, একটা বাস ছুটছে দুরন্ত বেগে। হঠাৎ যদি ব্রেক কষে, আরোহীর কী হবে?'

'যাত্রীরা অন্যমনস্ক থাকলে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।'— হীরু চটপট জবাব দেয়।

'কেন?'

হীরু বলল, 'এখানে নিউটনের প্রথম সূত্র কাজ করছে। স্থির বস্তুর মতো গতিশীল বস্তুরও জড়তা আছে। একে বলে গতিজাড্য। গতিশীল বস্তু গতিতেই থাকতে চায়। নিজে থেকে গতির পরিমাণ ও গতির অভিমুখ পরিবর্তন করে না। আরোহীর গতির মান আর বাসের গতির মান সমান। আরোহীর গতিও সমানের দিকে। তাই বাসটা থেমে গেলেও আরোহী তার দেহের গতিজাড্য বশতঃ সামনের দিকে যেতে চায়। এজন্য সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।'

'বেশ! বেশ। এবার বল, বাস ছুটছে কী করে?'

'ইঞ্জিনের শক্তিতে চাকাগুলো ঘোরে, তাই বাসও চলে'।—হীরু নড়েচড়ে বসল।

'তাহলে বলতে চাস, চাকা ঘুরলেই বাস চলবে?'

'নিশ্চয় ।'—বীরু-হীরু সমস্বরে জবাব দিল।

'আচ্ছা বেশ। একটা চাকা যদি নরম এঁটেল কাদায় আটকে যায়, তখন তো চাকা ঘোরান যাবে। বাস কী চলবে ?'

'না তো।'—অস্ফুট স্বরে জবাব দিল বীরু।

'তাহলে চাকা ঘুরলেই গাড়ি চলে না—বুঝতে পারছিস ?'

বীরু-হীরু ঘাড় নেড়ে বলল, 'ব্যাপারটা তাই বটে।'

'এবার তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, গাড়ি চলে রাস্তার ধাক্কা খেয়ে।'

'কি রকম ?' হীরুর ব্যগ্র জিজ্ঞাসা : 'রাস্তা কীভাবে ধাক্কা দেয় ?'

'বেশ রহস্যজনক মনে হচ্ছে তাই না ? বলছি, বলছি।' দাদু বললেন, 'তার আগে কথা আছে। সেটা বলি। মন দিয়ে শোন্। একটু ভজোকটো। এই ধাক্কাই হলো বাহ্যিক বল। ধরা যাক, বল=F

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে

$$\frac{\text{ভর} \times \text{অন্তিমগতি} - \text{ভর} \times \text{প্রাথমিক গতি}}{\text{সময়}} = F$$

অর্থাৎ $$\frac{\text{ভরবেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}} = F$$

হলো তো ? এবার রথের প্রসঙ্গে আসা যাক। বলত, নিউটনের তৃতীয় সূত্রটা। জানিস নিশ্চয়।'

'ক্রিয়া থাকলেই তার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটবে।'—বীরু বলল তার বিদ্যে উজাড় করে।

দাদু মৃদু হাসলেন। 'ঠিক। আচ্ছা ঘোড়া বল প্রয়োগে রথকে সামনের দিকে টানে। তাই তো ?'

বীরু-হীরু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'বেশ। রথও তাহলে সমান বলে ঘোড়াকে পিছনের দিকে টানে। —একথা ঠিক কি না ?'

বীরু-হীরু ঘাড় নেড়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তবে তো রথের এক চুলও নড়া উচিত না। কিন্তু কার্যত কী ঘটে ? ঘোড়াসহ রথ সামনে চলে অবাধে। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন বাহ্যিক বল কাজ করে। সে-টা কী ?'

দাদুর যুক্তির প্যাঁচে পড়ে বীরু-হীরু হাবুডুবু খায়। কথা বলতে পারে না। কেবল উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে দাদুর মুখের দিকে।

'জানি, তোরা জবাব দিতে পারবি না। তবে শোন:

ঘোড়া আর রথের টানাটানির ফলে উভয়েরই ভরবেগের পরিবর্তন হয়। ঘোড়ার উপর ক্রিয়াশীল বল আর রথের উপর ক্রিয়াশীল বল হবে পরস্পর সমান ও বিপরীতমুখী। ধরা যাক ঘোড়ার উপর ক্রিয়াশীল বল $=F$ আর রথের উপর ক্রিয়াশীল বল $=-F$।

$$\text{তাহলে,}\quad \frac{\text{ঘোড়ার ভরবেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}=F \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots (১)$$

$$\frac{\text{রথের ভরবেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}=-F \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots (২)$$

উভয় সমীকরণ যোগ করলে

$$\frac{\text{ঘোড়ার ভরবেগের পরিবর্তন}+\text{রথের ভরবেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}=0$$

সুতরাং ঘোড়ার ভরবেগের পরিবর্তন $+$ রথের ভরবেগের পরিবর্তন $=0$

এ-থেকে কী বোঝা গেল? ঘোড়া ও রথ একত্রে ধরলে এদের পরস্পর টানাটানির ফলে মোট ভরবেগের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আলাদাভাবে ধরলে ভরবেগের পরিবর্তন হয়। সুতরাং বলা চলে, ঘোড়ার উপর বল আর রথের উপর বল—এ দুটি বল ঘোড়াসহ রথের অভ্যন্তরস্থ বল। কাজেই ঘোড়াসহ রথকে চালাতে দরকার বাহ্যিক বল। মাথায় কিছু ঢুকল?'

ওরা মাথাই নাড়ল। কিছু বুঝেছে কিনা বোঝা গেল না।

দাদু বলে চললেন, 'ঘোড়া যখন পা দিয়ে তেরছাভাবে রাস্তার বুকে বল প্রয়োগ করে, রাস্তাও তখন ঘোড়ার উপর তেরছাভাবে প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে। রাস্তার এই প্রতিক্রিয়া হলো ঘোড়াসহ রথের উপর বাহ্যিক বল। অতএব রথ ঘোড়ার টানে মোটেই চলে না; চলে বাহ্যিক বলের প্রভাবে। অর্থাৎ রাস্তার ধাক্কা খেয়ে। পরিষ্কার হচ্ছে?'

ওরা চুপ করে রইল।

দাদু একটু থেমে, ফের বলতে শুরু করলেন:

'এবার কর্ণের রথের প্রসঙ্গে আসা যাক। রাস্তার মাটি নরম থাকার দরুণ কিংবা রাস্তায় গর্ত থাকার জন্যে অথবা অন্য কোন কারণে, রথের উপর বাহ্যিক বল কাজ করেনি। অর্থাৎ রাস্তা বুক দিয়ে কর্ণের রথকে ধাক্কা দেয় নি। এই বৈজ্ঞানিক সত্যটাই ব্যাসদেব রহস্যময় করে বলেছেন, 'মেদিনীর আকর্ষণে কর্ণের রথচক্র অচল হয়ে পড়ে।' কিরে, মাথায় ঢুকেছে?'

এবার ওরা বলল, 'অনেকটা।'

বিজ্ঞান-কুশলী ডাকাত

সেদিন গল্পের আসর চনমনিয়ে উঠল হীরুর কৌতূহলী জিজ্ঞাসায়:
'দাদু, তুমি নাকি ব্যাংক-ডাকাত ধরেছিলে, হাতেনাতে?'

শুনে দাদুর খাসা চেহারার বিপুল বপুখানি ঈষৎ দুলে উঠল। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হুঁ।' পরক্ষণে সংশোধন করলেন: 'আমি না, পুরোপুরি কৃতিত্বের দাবিদার হলো মৃত্যুঞ্জয় স্বয়ং। আমি তাকে সাহায্য করেছিলুম এই যা।'

'তা সরকারের এত জাঁদরেল পুলিশ, ঝানু গোয়েন্দা থাকতে, তোমরা—?' বিস্মিত কণ্ঠে বীরু জিগ্যেস করল।

দাদু সস্নেহে তাকালেন। গলায় মোলায়েম স্বর ফুটে উঠল। 'ওরা তখন লেজে-গোবরে। শেষ পর্যন্ত ডাকাতির কোন কিনারা হল না। তাই কেন্দ্রীয় সরকার মৃত্যুঞ্জয়ের উপর অনুসন্ধানের ভার দিল। বৈজ্ঞানিক হিসেবে তখন তার খুব নামডাক।'

'ডাকাত ধরতে বৈজ্ঞানিক!'

স্মিত হেসে দাদু বললেন, 'ডাকাতি হয়েছিল এক অভিনব কায়দায়। পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে সুরক্ষিত শহর হিসেবে বম্বের স্থান অনেক উঁচু। সেখানে ব্যাংক লুট হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। তা একটা নয়। এক রাতে পাঁচ-পাঁচটা। একটা আবার থানার নাকের ডগায়। চাবি-তালা কিংবা দরজা-জানলা ভেঙে হলে, কথা ছিল। ইটের দেয়াল ভেঙে। একেবারে নিঃশব্দে। পুলিশ, পাহারাওলা—কেউই টের পেল না ঘুণাক্ষরে। তাই ওপরওয়ালার সন্দেহ, ডাকাতির কলা-কৌশলে হয়ত বিজ্ঞানের অদৃশ্য হাত আছে। যা হোক, আমাকে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় একদিন সরজমিনে তদন্তে গেল।

গেলাম। তাক-লাগানো ব্যাপার। দেয়ালে একটা মস্ত গর্ত। দু-চারজন এক সংগে ঢুকতে বা বেরুতে পারে স্বচ্ছন্দে। গর্তের চারপাশ ফেটে চৌচির। অমন সিমেন্টের পলেস্তারা অনেকখানি জায়গা জুড়ে খসে খসে পড়েছে। সারবন্দী ইটের ভাঙাচোরা চেহারা দৃষ্টিতে ধাক্কা দিল। শাবল, গাঁইতি বা ঐ জাতীয় যন্তর দিয়ে যে একাজ অসম্ভব তা বুঝতে দেরি হল না। সব কটা ব্যাংক এই একই কায়দায় লুঠ হয়েছে।

বাড়ি ফিরে মৃত্যুঞ্জয় কানে শব্দরোধক যন্ত্র লাগিয়ে গভীর চিন্তার মধ্যে তলিয়ে গেল।

'শব্দরোধক! সে আবার কী?' হীরু সবিস্ময়ে জিগোস করল।

'ওটা লাগানো থাকলে কানের ভিতর কোন শব্দ ঢুকতে পারে না। শব্দ-দানবের হাত থেকে বাঁচতে হলে বা একমনে চিন্তা-ভাবনা করতে গেলে এ-যন্তর অবশ্যই দরকার।'

'কেন? শব্দ কী আমাদের ক্ষতি করে?' বীরু সহসা প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিল।

'সব শব্দ ক্ষতিকারক না। সীমিত ছন্দোবদ্ধ শব্দ যেমন সুললিত সুরের মূর্ছনা মানুষকে মুগ্ধ করে, তেমনি অবাঞ্ছিত শব্দ বা শব্দ-দূষণ (Noise pollution) মানুষকে দগ্ধ করে। মাইকের বিকট কর্কশ শব্দ, চকোলেট বোম, ফটকা, ব্যাণ্ডবাদ্য, ঘন্টা প্রভৃতির গগনভেদী আওয়াজ, যানবাহনের শব্দ, হিন্দি-সিনেমার কানফাটানো হিটগান, চিৎকার, চেঁচামেচি ইত্যাদি শব্দ-দূষণের আওতায় পড়ে। শব্দের আন্তর্জাতিক মাপকাঠি হল ডেসিবেল (Decibel)। শব্দের মাত্রা নব্বই থেকে একশ' কুড়ি ডেসিবেল হলে মানুষ কালা হয়ে যেতে পারে। এমন কী মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে। শুধু কী তাই? হৃদরোগ, পাকস্থলীর ঘা (Peptic ulcer) প্রভৃতি রোগ মানুষের অকাল-মৃত্যুকে ডেকে আনতে পারে। ভারতের অধিকাংশ শহর ত এখন এই শব্দ-দানবের কবলে পড়ে ধুঁকছে। সরকারের তরফ থেকে প্রতিরোধের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। মানুষ অসহায়। দুর্বিষহ জীবনযাত্রা। আমিও কষ্ট পাচ্ছি।' দাদুর চোখেমুখে উত্তেজনার অভিব্যক্তি। একটু থেমে তিনি বলতে শুরু করলেন, 'যাক। এবার আসল গল্পটা শোন।'

খানিক পরে মৃত্যুঞ্জয় আমাকে জিগোস করল, 'ডক্টর পিল্লাইকে চিনিস?'

আমি বলি, 'চাক্ষুষ পরিচয় নেই। তবে নাম শুনেছি। বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী।'

'হ্যাঁ ঠিক।' মৃত্যুঞ্জয় মাথা দুলিয়ে বলল। 'এই শব্দরোধক যন্তরটা তাঁরই তৈরী। উপহার দিয়েছেন। তাঁর একটা ভাল ড্রাইভার দরকার। হপ্তা-খানেক আগে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যোগাড় করে দিতে। ভাবছি, তুই যদি আপাততঃ চাকরিটা করিস, তদন্তে সুবিধা হয়। তবে খুব হুঁশিয়ার। আসল পরিচয় যেন টের না পায়।'

মৃত্যুঞ্জয়ের নির্দেশমত মহম্মদ সফি ছদ্মনামে ডক্টর পিল্লাই-এর গাড়ি চালাতে লাগলাম। তাঁর গবেষণা ও গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখি।

এক বাদলা রাতে। বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ, তার সংগে বিদ্যুতের চমকানি। মাঝে মাঝে বাজ—কড়-কড়-কড়াৎ। প্রচণ্ড লোডশেডিং। দুর্ভেদ্য অন্ধকার। এই দুর্যোগে পুলিশের একটা বড়গোছের কালো গাড়ি চালাবার হুকুম হল। কেমন যেন খটকা লাগল। মৃত্যুঞ্জয়কে তড়িঘড়ি বেতার-সংকেত পাঠালাম।'

দাদুর ঠোঁটের কষে ফেনা দেখা গেল। একটানা কথা বললে মুখে এই রকম থুতু জমে যায়। হাতের কাছে ঢাকা-দেওয়া জলের গেলাস ছিল। এক চুমুকই যথেষ্ট। গলা ভিজিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন:

জামার মধ্যে লুকনো টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে দিলাম। ডক্টর পিল্লাই আর জনা-পাঁচেক ষণ্ডামার্কা-গোছের লোক এসে গাড়িতে উঠল। ডক্টর পিল্লাই-এর নির্দেশমত গাড়ি চালাতে লাগলাম। এ-রাস্তা-ও-রাস্তা দিয়ে মোড় ঘুরে ঘুরে গাড়ি ছুটতে লাগল। বম্বের রাস্তাঘাট আমার নখদর্পণে। তবু কোথা দিয়ে যে কোথায় যাচ্ছি ঠিক মালুম হল না। রাস্তা-গুলো ফাঁকা। হোটেলের হৈ-হুল্লোড় তখন থিতিয়ে এসেছে। সারি সারি দোকান হোটেল বাড়ি-ঘর সব বন্ধ। একটা জমাট অন্ধকারের আস্তরণ অমন ঝকমকে শহরটাকে যেন প্রেতপুরী বানিয়েছে। অঘটনের গন্ধ পেলাম যেন। রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। শেষে গাড়ি থামালাম একটা মস্ত থামের আড়ালে। বিদ্যুত-চমকানো আলোয় দেখলাম থামটা ইয়া মোটা। গাড়ি থেকে হুড়মুড় করে ওরা নামল। পেছনের ঢাকনা খুলল। ঝনঝন শব্দ কানে এল। সম্ভবতঃ যন্ত্রপাতির শব্দ। ফিস্-ফিস্ স্বরে কথাবার্তা হচ্ছিল। কিস্সু বোঝা গেল না। গুরু গম্ভীর স্বরে ডক্টর পিল্লাই শুধু আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। মুহূর্তে ওরা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছিলনা। মৃত্যুঞ্জয়কে বেতার-বার্তা পাঠালাম। ভয়, উত্তেজনা ও কৌতূহলের একঘেয়েমির মধ্যে সময় খুব ধীরে কাটতে লাগল। বুঝলাম, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ফাঁদে পড়েছি।'

'আপেক্ষিকতাবাদ! সে আবার কী?' বীরু ব্যগ্রভাবে জিগ্যেস করল।

দাদু বললেন, 'জটিল কিছু না রে। তবে ভারি মজার ব্যাপার। সংক্ষেপে বলি। ধর, আমি তোদের সংগে আধঘন্টা ধ'রে গল্প করলাম। এই আধঘন্টা সময়ের ব্যাপ্তি আমাদের কাছে যেমন, অন্যলোকের কাছেও তেমনি হবে। এতটুকু কম-বেশী হবে না। সময়ের গতি বিশ্বের সর্বত্রই এক। তার কোনো পরিবর্তন নেই। তাহলে সময় হল পরম (Absolute)।

'তাই তো ?' ওরা সায় দিল ঘাড় নেড়ে। দাদু বললেন, 'তোদের মত সেই সময়কার বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল তাই। আইনস্টাইন কিন্তু এই মতের বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, এই আধঘন্টা সময় সকলের কাছে একই পরিমাণ সময় হবে না। সময় আপেক্ষিক, পরম না। গতি-বেগের সংগে সময়ের সম্পর্ক আছে। এই মহাবিশ্বে কোন কিছু স্থির না। সবই গতিশীল। ঘর-বাড়ি, গাছপালা স্থির বলে মনে হয়। সত্যই কী তাই ? পৃথিবীর সংগে এগুলো-ও ঘুরছে। তবে সকলের গতি সমান না। তাহলে গতিবেগ হল আপেক্ষিক। একটা গতিশীল বস্তুর সংগে তুলনা করে অন্য গতিসম্পন্ন বস্তুর গতিবেগ জানতে হয়। ট্রেনের গতি ঘন্টায় ৬০ কিমি। এটা গাছপালা ইত্যাদির আপেক্ষিকে গতিবেগ।'

দাদু একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন :

'সময়কে প্রকাশ করে ঘটনা। ঘটনা ঘটছে বলেই সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায়। যেমন চোখ না থাকলে রঙ বলে কিছু নেই. তেমনি প্রতিটি ঘন্টা কিংবা প্রতিটি দিন প্রভৃতি ঘটনার দ্বারা চিহ্নিত না হলে সময়ের কথা বলা অর্থহীন! সময় হল ঘটনার কাঠামো যা এক-এক গতিশীল দ্রষ্টার কাছে এক-এক রকম। কোন ঘটনার সময়ের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় ঘড়ি থেকে। আমাদের ঘড়ির ক্রিয়া সৌরজগতের নিয়মের অধীন। সৌর-জগতের বাইরে পার্থিব সময়ের ধারণা অর্থহীন। আপেক্ষিকতাবাদে ঘড়ির অর্থ হলো—যে যন্ত্র অবিরাম নিয়মিতভাবে স্পন্দিত হচ্ছে এবং যার দোলন কাল সর্বদা একই মানের। এই হিসেবে একটি পরমাণু-ও ঘড়ি ; কারণ এর ভিতর ইলেকট্রন নিয়মিতভাবে ঘুরছে। পৃথিবীও একটি ঘড়ি, কারণ এটি ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে নিজের অক্ষের চারদিকে একবার সম্পূর্ণভাবে পাক খাচ্ছে। সংক্ষেপে কতকগুলো নিয়মিত ঘটনার সমষ্টি হল, ঘড়ি। দ্রষ্টার আপেক্ষিক গতিবেগের সংগে সংগে দুটি ঘটনার কাঠামো অর্থাৎ সময় বা ঘড়ির ছন্দ-ও বদলে যায়। সেই কারণে তারা দেখে যেন অপরের ঘড়ির এক সেকেণ্ডের ব্যাপ্তি অনেকখানি। অতএব ঘড়িতে এক সেকেণ্ড ঘটনাটি

আপেক্ষিক। একজনের কাছে যা এক সেকেণ্ড অপরের কাছে তা এক সেকেণ্ড নাও হতে পারে।'

বীরু-হীরু একসংগে বলে উঠল, 'ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে। বুঝতে পারছি না।'

'ধর', দাদু বললেন, 'তোর হাতের একটা আঙুল ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে দেওয়া হলো। তখন এক মিনিটকে তোর মনে হবে এক ঘন্টা। তাই না?'

বীরু-হীরু ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ ঠিক।'

'এবার মনে কর, এখানে দূরদর্শনের পর্দায় ক্রিকেট খেলা দেখছিস। সময় কোথা দিয়ে কেটে যাবে টের পাবি না। একঘন্টা সময় মনে হবে এক মিনিট। এই হল আপেক্ষিকতাবাদ। বুঝলি হাঁদারাম?'

বীরু-হীরু তখন সোল্লাসে বলল, 'বাঃ বাঃ কী সোজা। আইনস্টাইন যদি আবিষ্কার না করতেন তাহলে আপেক্ষিকতাবাদ আমরাই আবিষ্কার করে ফেলতাম নির্ঘাত।'

দাদু তখন মুচকি হেসে বললেন, 'আচ্ছা বেশ। সময়ের পরিবর্তনটা এবার সমীকরণে প্রকাশ করি। মন দিয়ে শোন্।'

দাদু বলতে লাগলেন:

'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে, সময় অপরিবর্তনীয় নয়, বিশ্বে অপরিবর্তনীয় হল আলোর বেগ। আলোর বেগ সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিমি। নিত্য ঘটনা ঘটতে দেখা যায় আলোর জন্যই। আলোর সংকেত প্রত্যেক দ্রষ্টাকে তার নিজের নির্ভুল সময় জানতে সাহায্য করে। আপেক্ষিক গতিবেগ যতই আলোর বেগের কাছাকাছি হবে, ততই সেই দ্রষ্টার কাছে সময় মনে হবে মন্থর। এবার তোদের সময়ের সূত্র বলি:

$$t'=t\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

চলন্ত মাধ্যমে একটি ঘড়ির কোন সময়ের মান t', পৃথিবীতে একটি ঘড়ির সেই সময়ের মান t., চলন্ত মাধ্যমটি ছুটে চলেছে সরল পথে এক অবিচল গতিতে পৃথিবীতে সংলগ্ন কোন স্থানাঙ্ক নির্ধারকের আপেক্ষিকে। ধরা যাক এই গতির মান সেকেণ্ডে v কিমি আর c হল আলোর বেগ (সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কিমি)।

পৃথিবীতে অবস্থিত পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে চলন্ত মাধ্যমে সময়ের প্রবাহ মন্থর। আবার চলন্ত মাধ্যমে পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে তার

সময়ের গতি ঠিকই আছে, পৃথিবীতে সময়ের প্রবাহ ঐ একই অনুপাতে ধীরে বয়ে যাচ্ছে।'

দাদু একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন। বললেন, 'ব্যাপারটা বুঝতে গেলে দৈর্ঘের সূত্রটা ঝালিয়ে নিতে হবে। দৈর্ঘের সূত্র হল

$$l'=l\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

পৃথিবীতে অবস্থিত একটি লাঠির দৈর্ঘ যদি l হয় তবে চলন্ত মাধ্যমে কোন এক পর্যবেক্ষকের কাছে লাঠির দৈর্ঘ হবে l'। ধরা যাক চলন্ত মাধ্যমটি একটি ট্রেন, যেটির দৈর্ঘ হল ৩০০,০০০ কিমি অর্থাৎ আলো এক সেকেণ্ডে যতদূর যেতে পারে। ট্রেনের গতিবেগ সেকেণ্ডে ২৪০,০০০ কিমি অর্থাৎ আলোর বেগের $\frac{৪}{৫}$ অংশ। ট্রেনের যে কামরায় পর্যবেক্ষক আছেন সেটির দৈর্ঘ যদি ১০০ মিটার হয়, ট্রেনের বাহিরে কোন পর্যবেক্ষকের কাছে সেটির দৈর্ঘ হবে ৬০ মিটার। আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী দু-জনের হিসেব নির্ভুল। এবার দৈর্ঘের সূত্র দিয়ে দুটি দৈর্ঘ যাচাই করা যাক।

$$l'=l\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$\therefore\ l'=100\sqrt{1-(\frac{4}{5})^2}=100\times\frac{3}{5}=60$ মিটার। ট্রেনের পর্যবেক্ষকের নিকট 100 মিটার দৈর্ঘ বাইরে পর্যবেক্ষকের নিকট হচ্ছে 60 মিটার। এটা সম্ভব হচ্ছে ট্রেনের বেগের জন্য।

বাইরে পর্যবেক্ষকের হাতে একটি ২০ মিটার দৈর্ঘের লাঠি আছে। এটি ট্রেনের গতির দিকে সমান্তরালভাবে ধরা আছে। চলন্ত ট্রেনের পর্যবেক্ষক লাঠির দৈর্ঘ দেখবেন $20\times\frac{3}{5}=12$ মিটার। যদি লাঠিটি ট্রেনের গতির দিকে লম্বভাবে ধরে রাখা হয়, ট্রেনের পর্যবেক্ষকের কাছে দৈর্ঘের কোন হেরফের হবে না, কারণ সংকোচন মনে হবে কেবল ট্রেনের গতির দিকে।

এবার একটি উদাহরণ দিলে সময়ের প্রবাহ কেন মন্থর হচ্ছে পরিষ্কার বোঝা যাবে। ধর, প্ল্যাটফরমে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনটি লোকটির কাছে আসামাত্র প্রথম কামরার সামনের দেয়ালে একটি আলো জ্বালা হল। ট্রেনে অবস্থিত পর্যবেক্ষক দেখবে, ঐ আলোর রশ্মি পিছন দিকে শেষ কামরার পিছনের দেয়াল আলোকিত করবে ঠিক এক সেকেণ্ড পরে। কিন্তু প্ল্যাটফরমে দাঁড়ানো লোকটি দেখবে দেয়ালটি আলোকিত

হল ৩/৫ সেকেণ্ড পরে। আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী দুটি সময়ের হিসেব ঠিক। দুই পর্যবেক্ষকের কাছে দু-রকম সময়ের কারণ কী?

শোন্ বলি:

'আলোর বেগ নিত্য, এটি কোন মাধ্যমের বেগের উপর নির্ভর করে না। অতএব চলন্ত ট্রেনের মধ্যে আলোর বেগের কোন পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিমি থাকবে। ট্রেনটির দৈর্ঘ তিন লক্ষ কিমি বলে আলো পিছনের দেয়ালে এসে পৌঁছবে ঠিক এক সেকেণ্ড পরে। কিন্তু প্ল্যাটফরমে দাঁড়ানো লোকটির নিকট ট্রেনের দৈর্ঘ্য মনে হবে $300,000 \times$ ৩/৫ $=$ 180,000 কিমি। অতএব 180,000 কিমি দৈর্ঘ অতিক্রম করতে আলোর লাগবে $\frac{180,000}{300,000}$ সেকেণ্ড অর্থাৎ ৩/৫ সেকেণ্ড।'

দাদু বার কয়েক খক খক করে কেশে নিলেন গলায় যেন কিছু আটকে গেছে। জল খেলেন। বললেন, 'বড্ড খটোমটো তাই না? তবে থাক্। আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলার ছিল। বুঝতে পারবি না। এখন বরং গল্পে ফিরে যাই।

আমি ত গাড়িতে একলা বসে রইলুম। এক-একটা মিনিট মনে হচ্ছে পাক্কা এক এক ঘন্টা। ওদের কী মতলব, আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি। হঠাৎ ছপছপ শব্দ কানে এল। উৎকর্ণ হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। বিদ্যুতের আলোয় চকিতে দেখতে পেলাম কয়েকটা ছায়ামূর্তি। হন-হন করে এগিয়ে আসছে। শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। দুমদাম-ঝনঝন আওয়াজ হল। গাড়িটা একটু ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। ডক্টর পিল্লাই-এর বাজখাঁই গলার তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানে ঢুকল—'স্টার্ট'।

গাড়ি ছুটতে লাগল একরকম বিনা বাধায়। ডক্টর পিল্লাই-এর নির্দেশ-মত ডাইনে বামে, এমোড়-ওমোড় ঘুরে শেষে এসে থামলাম তাঁরই বাগান বাড়িতে।

গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে আর এক বিস্ময়। দেখি, আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী।

ডক্টর পিল্লাই সমেত তাঁর সাকরেদরাও গ্রেপ্তার হলেন। গাড়ির মধ্যে পাওয়া গেল তাড়াতাড়া নোট আর হরেক রকমের যন্তর। মৃত্যুঞ্জয় পরীক্ষা ক'রে বলল, 'আমি যা আন্দাজ করেছিলুম, তাই ঠিক। আসলে ওগুলো হল আলট্রাসনিক শব্দ-তরঙ্গ তৈরী করার যন্তর। ডক্টর পিল্লাই হলেন নাটের গুরু।'

'আলট্রাসনিক শব্দ-তরঙ্গ কী?' সাগ্রহে জিগ্যেস করল বীরু।

দাদু বললেন, 'সাধারণ শব্দ-তরঙ্গ কানের পর্দায় আঘাত করলে, আমরা শুনতে পাই। কিন্তু আলট্রাসনিক শব্দ-তরঙ্গ কানের পর্দায় আঘাত করলে স্নায়ুতে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। তাই শোনা যায় না। এই শব্দ-তরঙ্গের মাপকাঠি হল হার্জ (Hertz)। ১৯৬ হার্জ শব্দ-তরঙ্গের ধাক্কা খেয়ে বড় বড় ইমারৎ ভেঙে পড়তে পারে। শুধু কী তাই। জীবাণু ধ্বংস কিংবা সমুদ্রে মাছ ধরার কাজেও আলট্রাসনিক শব্দ-তরঙ্গ ব্যবহার করা যেতে পারে। এই শব্দের কিছু কিছু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, মাংস হাড় ইত্যাদি ভেদ করতে পারে না। আজকাল চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা হার্ট, লিভার, ব্রেন প্রভৃতির আলট্রাসনিক স্ক্যানিং করছেন।'

'আচ্ছা দাদু, ডক্টর পিল্লাই-এর মত অত বড় বৈজ্ঞানিক ব্যাংক-ডাকাতির মত নোংরা কাজে কেন পা বাড়লেন?' বীরু জিগ্যেস করল।

দাদু বিষন্ন মুখে বললেন, 'হঠাৎ কোটিপতি হবার স্বপ্ন। তবে ডক্টর পিল্লাইকে শুধু দোষ দিয়ে লাভ নেই। আজকাল ত বহু বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানকে হীন জঘন্য কাজে প্রয়োগ করছে। এ-সব উন্মত্ত খুনী বিজ্ঞানীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে পৃথিবী কেঁপে উঠেছে। মানব-সভ্যতা জাহান্নামের পথে পা বাড়িয়েছে। সুখ-শান্তি, নিশ্চিন্ততা, প্রগতি—সবই আস্তে আস্তে জীবন থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। আজকের সভ্যতার যন্ত্রদানবের বিকট গর্জন, উল্লাস আর হুংকারের শব্দ দূষণ হচ্ছে এযুগের অভিশাপ।'

'দাদু, আমরা যদি সবাই শব্দরোধক যন্ত্র কাজে লাগাই?' বীরু সমস্যার সমাধান খুঁজতে ব্যগ্র হলো।

দাদু হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন।

'ওরে পাগল, তা কি সম্ভব? জনপ্রতি একটি করে এই যন্ত্র লাগাতে হলে গোটা দেশটাই বিকিয়ে যাবে—এত সহজ? তারচেয়ে আইন করলে এবং শক্তহাতে সেই আইন প্রয়োগ করলে, হয়তো শব্দদূষণ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।'

বীরু মাথা নাড়ল, 'আইন তো আছে কিন্তু মানছে কই?'

'বিচিত্র এ দেশ, বুঝলি?' দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আফ্রিকা থেকে আমদানি

সেদিনের স্মৃতি আজো মলিন হয়নি। বুদ্ধ পূর্ণিমায় গেছি বোম্বাই। মিতুর চেম্বারে বসে আছি। বৈকাল-সূর্যের সোনালী ছটা মেঝের ওপর রঙ ছড়াচ্ছে। সাম্য, শান্তি, মৈত্রী, ক্ষমা ও অহিংসার অবতার ভগবান-বুদ্ধকে কেন্দ্র করে আমাদের আলোচনা বেশ জমে উঠেছে। এমনি সময় অকস্মাৎ ঘরে ঢুকলেন এক ভদ্রলোক। খুব সুপুরুষ, আমাদেরই বয়সী। জোড়হাতে তিনি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালেন। 'একটু বিরক্ত করতে এলাম। মাপ করবেন।'—কুণ্ঠিত স্বরে তিনি বললেন ইংরাজিতে।

মিতু বিস্মিত চোখ মেলে তাকালো। তারপরই যেন চিনতে পাবল। বলল, 'আরে, মিঃ শর্মা যে! প্রতি নমস্কার জানিয়ে সে আবার বলল, 'অত লজ্জার কী আছে? আসুন। বসুন।'

মিঃ শর্মা আমার পাশে একটি চেয়ার দখল করলেন। আমাদের পরিচয় পর্ব শেষ হলো। মিতু জিগোস করল, 'তা হঠাৎ কী মনে করে?'

'এসেছি একটা জরুরি কাজে।'

'জরুরি কাজ তো ডাক্তারদেরই একচেটিয়া। বীমা কোম্পানির ম্যানেজারের আবার 'জরুরি' কী?'—মিতু রসিকতা করে বলল।

'ভীষণ বিপদ, ডক্টর। জীবনে এত বাড়তি উপদ্রব পোহাতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। আপনার সাহায্য ছাড়া উদ্ধারের রাস্তা নেই।'—মিঃ শর্মার মুখচোখে দুর্ভাবনার কালো ছায়া স্পষ্ট।

'বাড়তি উপদ্রব! কি রকম?' মিতু সোজা হয়ে বসল।

মিঃ শর্মা বলতে লাগলেন, 'গত এক মাসের মধ্যে আমাদের জনা-দশেক টাটকা বীমাকারী টপাটপ টেঁসে গেছে। কারো বীমা লাখের নিচে না। একজন বড্ড জোর দু'টো কিস্তি দিয়েছে। তিনি একটু থামলেন। আবার বললেন 'বুঝতেই তো পারছেন, ডক্টর। খেসারতের পরিমাণটা…। টাকা তো খোলামকুচি না।'

'ঠিকই। মারা যখন গেছে টাকা তো দিতেই হবে। এবং বেশ মোটা টাকাই। বলুন আমি কী করতে পারি?'

মিঃ শর্মা লম্বা শ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ সেটা-ই বলতে এসেছি।

সাধারণভাবে খুবই অস্বাভাবিক। সবারই কিন্তু একই রোগ—ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস।'

'হতেই পারে। অসুখটা যে সংক্রামক।'—বলল মিতু।

'এ রোগ সংক্রামক, জানি। আমার প্রশ্ন, রোগটা কেন বীমাকারী-দেরই বেছে-বেছে ধরল? বাইরের কারো তো হতে পারত।'

'খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছেন?' —মিতু ভ্রুজোড়া কুঁচকে জিগ্যেস করল

'ইয়েস ডক্। বোম্বের প্রতিটি হাসপাতাল, নার্সিং হোম…। এভন্ ম্যাডরাস্, ক্যালকাটা।'

'আচ্ছা, ওরা কী একই জায়গার বাসিন্দা? মানে যারা মারা গেছে?'

'না ডক্টর। দূরে দূরে।'

'হুঁ। ব্যাপারটা জটিল বটে। আচ্ছা, কেউ কী এ-রোগে এখনো ভুগছে?'

'হ্যাঁ ডক্টর। দু'জন। গুড্ উইল নার্সিং হোমে…?'

'অবস্থা কেমন?'

'ভালো না।'—মিঃ শর্মার মুখমণ্ডল বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল।

'তাহলে আমাকে একবার দেখতে হয়।'

'বেশ ত। আমার সংগে চলুন-না। কার ইজ রেডি।'—মিঃ শর্মার স্বরে ব্যগ্রতা।

মিতুর সঙ্গে আমিও গেলাম। মিতু রোগীদের পরীক্ষা করল। রক্তের নমুনা নিল। মিঃ শর্মাকে আড়ালে ডেকে বলল, 'বীমাকারীদের দলিলগুলো নিয়ে দেখা করবেন।' পরের দিন দলিলগুলো অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো মিতু। জিগ্যেস করল, 'কিস্তির টাকা কে দিতো'?

মিঃ শর্মা॥ কেন? বীমাকারী নিজে।

মিতু॥ আজ আপনি যখন এলেন তখন রোগী দুটির খবর নিয়েছিলেন কী?

মিঃ শর্মা॥ মারা গেছে।

মিতু॥ সেরকম আশংকাই করেছিলুম। সব ক-টা দলিলে দেখছি, মনোনীতক একজনই—ডাঃ বর্ধন। ডাঃ বর্ধনের সাথে বীমাকারীদের সম্পর্কটা কীরকম জানেন'?—জিজ্ঞাসু ভুরু তু'লে মিতু তাকালো মিঃ শর্মার দিকে।

মিঃ শর্মা একটু চমকে উঠে বললেন, 'আত্মীয়-টাত্মীয় না। পারিবারিক চিকিৎসক। পাশ-করা না। তবে হাতযশ আছে'।

'ডাঃ বর্ধনের সংগে একবার মোলাকাত ক'রে দিতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই। তবে মুস্কিল হলো ডক্টর—তাঁকে তো কিছুদিন পাওয়া যাবে না।'

'কেন?'

'দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। যখন-তখন বেড়াতে যান। বাতিক আর কি।'

'বুঝলাম। এখন কোথায়?'

'বোধ হয় মার্কিন মুল্লুকে।'

'নাঃ। আফ্রিকায়। আচ্ছা দেখছি।' মিতু ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর অফিসের সংগে দূরভাষে কথা সেরে নিল। রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, 'আমার আন্দাজ ঠিক। উগাণ্ডায়।'

'আফ্রিকার জংগলে! বেড়াবার মতো জায়গা বটে। পাগল আর কাকে বলে?'—মিঃ শর্মার কণ্ঠে বিস্ময়-বিদ্রূপ।

'হুঁঃ। সেয়ান পাগল। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।—কাজটা জরুরি।'

'বলুন ডক্টর।'—

'বিমান বন্দরে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বিমান থেকে নামার সংগে সংগে ডাঃ বর্ধনকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করুন।'

'তাঁর অপরাধ? পুলিশ প্রমাণ চাইবে।'

'প্রমাণ আমি দেব। অপরাধের ফিরিস্তিও।'

পরিকল্পনা মতো পুলিশের সাহায্যে ডাঃ বর্ধনকে গ্রেপ্তার করা হলো খুনের অভিযোগে। তল্লাসী করে পাওয়া গেল একটা অদ্ভুত ধরনের কাচের সরু নল। অবিকল তাপমান যন্ত্রের মতো। তখুনি সে-টা বাজেয়াপ্ত করবার নির্দেশ দিল মিতু। ডাঃ বর্ধনের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল।

'কেন দাদু?'—বীরুর কৌতূহলী প্রশ্ন।

'ওটা তাপমান যন্ত্র না। তবে এমন কৌশলে তৈরী যে, সাধারণ লোক তাপমান যন্ত্র বলে ভুল করবে। জানিস, ও-টা থেকেই মিলল রহস্যের কিনারা। নলের ভেতর পাওয়া গেল গোটা-কতক মশা—ইডিস্ ইজিপটাই। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে ধরা পড়ল মশার রক্তে গ্রুপ বি আরবো ভাইরাসের অস্তিত্ব।'

'ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ? সাধারণ অণুবীক্ষণে কী ভাইরাস দেখা যায় না?'—প্রশ্নটা হীরুর।

দাদু কপট গাম্ভীর্যে বললেন, 'তোরা আর্নস্ট রাস্কার নাম শুনেছিস্?'

বীরু-হীরু নিরুত্তর দেখে দাদু বলতে লাগলেন,

'তবে শোন্। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ আবিষ্কারের জন্যই আর্নস্ট রাস্কা ১৯৮৬ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। থাক সে কথা। এখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কথা বলি—বস্তুর উপর আলোর রশ্মি প'ড়ে প্রতিফলিত হয়ে অণুবীক্ষণে আসে; ফলে ক্ষুদ্র বস্তুকে অধিকতর বড় আকারে আমরা দেখতে পাই। তবে আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘের সংগে বস্তুর আয়তনের (size) একটা সম্পর্ক আছে। বস্তু যদি আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘের চাইতে ক্ষুদ্র আকারে হয়, বস্তুটি আলোর পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। আলো বস্তুকে অতিক্রম করে চলে যায়। ফলে বস্তুটিকে আমরা দেখতে পাই না। আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ হলো 0·4 থেকে 0·8 মাইক্রন (Micron) অর্থাৎ 4×10^{-5} থেকে 8×10^{-5} সেমি পর্যন্ত। (এক মাইক্রন$=10^{-6}$ মিটার বা এক সে. মিটারের 10 হাজার ভাগের এক ভাগ।)

পেঁয়াচে লাগছে তো? আচ্ছা ব্যাপারটা আরও একটু খোলসা করি। আরবো ভাইরাসের আয়তন সাধারণত: 40 থেকে 100 মিলি মাইক্রন অর্থাৎ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘের চেয়ে ক্ষুদ্রতর। ফলে দৃশ্যমান আলোর দ্বারা সাধারণ বীক্ষণে এদের দেখা যায় না। তাই আলোর বদলে ইলেকট্রনকে কাজে লাগান হয়েছে এ-জাতীয় ভাইরাসকে চিহ্নিত করতে। কারণ ইলেকট্রনের আকার বা আয়তন আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘের প্রায় 10 কোটি ভাগের একভাগ। ইলেকট্রনের ব্যাস হলো 10^{-13} সেমি অর্থাৎ ভাইরাসের আয়তনের চেয়ে ক্ষুদ্রতর। চুম্বক কুণ্ডলি থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়। তাই সাধারণ বীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের জায়গায় বসান হয়েছে চুম্বক।'

'দাদু, ডাঃ বর্ধনকে কেন গ্রেপ্তার করা হলো?'—বীরু জিগ্যেস করল।

দাদু গম্ভীর মুখে বললেন, 'অপরাধ গুরুতর। বীমাকারীদের আদপে 'ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস হয়নি। হয়েছিল পীতজ্বর। রোগ নির্ণয় করতে ডাক্তারবাবুরা ভুল করেছিলেন।'

'ধরা পড়ল কি করে?'

দাদু ব্যাখ্যা করেন, 'প্রথমত: পীতজ্বর ভারতে হয় না। কেনিয়া, উগাণ্ডা, জাম্বিয়া প্রভৃতি দেশে এ-রোগের দাপট আছে। তাই এখানকার

চিকিৎসকদের সন্দেহ হয় নি। দ্বিতীয়তঃ পীতজ্বরের লক্ষণ অনেকটা 'ইনফেকটিভ হেপাটাইটিসে'র মতো। তবে মিতু অভিজ্ঞ চোখে বুঝতে পেরেছিল। তাছাড়া, রক্ত পরীক্ষায় পীতজ্বরের ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। ইডিস ইজিপটাই নামক মশার রক্তেও পীতজ্বরের ভাইরাস পাওয়া যায়। পুলিশের জেরায় ডাঃ বর্ধন স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন,—এ রোগের ভাইরাস বহনকারী মশা তিনি আফ্রিকা থেকে আমদানি করতেন। মশা-ভর্তি কাচের নলটা দেহের তাপ-মাপার ছলে রোগীর বগলে গুঁজে দিতেন। মশার কামড়ে রোগীর দেহে পীতজ্বরের ভাইরাস ঢুকে পড়তো।'

'ডাঃ বর্ধনের কেন পীতজ্বর হলো না? মশা তাঁকেও তো কামড়াতে পারে?'—সপ্রতিভ মুখে জিগ্যেস করল হীরু।

'বাঃ চমৎকার!' দাদু হীরুর প্রশ্ন শুনে উচ্ছ্বাসিত। সহাস্যে বললেন, 'হতে পারতো। কিন্তু ডাঃ বর্ধন তো অতো কাঁচা লোক নন। আগে থেকে তিনি পীতজ্বরের প্রতিষেধক টিকা নিয়েছিলেন নিশ্চয়ই।'

'এখন তাহলে মিঃ শর্মার বীমা-কোম্পানি বেশ চালু তাই-না?'

'হ্যাঁ। মিঃ শর্মা তোদের একদিন মিষ্টি খাওয়াবে বলেছে।'

বীরু-হীরু হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'মিঃ শর্মা কী ভালো! কী ভালো'।

রক্তের ভেতর হানাদারি

'পালালো! পালালো! পাকড়ো! পাকড়ো!'

নরীম্যান পয়েন্টের অদূরে বোম্বাইয়ের গমগমে রাস্তায় রীতিমতো শোরগোল উঠল সেদিন। ছিনতাই হয়েছে একটি চকচকে চামড়ার ব্যাগ —হাজার-বিশেক কড়কড়ে নোটে ঠাসা। ব্যাংকে জমা দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল এক যুবক। বেশ লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। বয়স আন্দাজ বাইশ্-তেইশ। ভিড় এড়াতে সে লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল ফুটপাতের কোল ঘেঁসে। এমন সময় আচমকা একটি মোটরবাইক তাকে পিছন থেকে মারল জোর ধাক্কা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। ব্যাগটি হাত থেকে ছিটকে যায়। আর তখনি মোটর-বাইকের পিছনে-বসা লোকটি ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিয়ে মুহূর্তে উধাও। চারদিকে ভিড়ের ভেতর থেকে আবার একটা চিৎকার—'হাসপাতাল। হাসপাতাল।' জনা-চারেক সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। ধরাধরি করে যুবকটিকে তুলে নিলেন একটি ট্যাক্সিতে।

এই যুবকটিব নাম সঞ্জয় লোহিয়া। মিতুর সুপরিচিত। মহারাষ্ট্রের অজগ্রামে বাড়ি। খুবই গরিব। মিতুর আর্থিক আনুকূল্যে বি. কম. পাশ করে সে। তারই সুপারিশে সঞ্জয় চাকরি পায় একটি নামকরা সদাগরি প্রতিষ্ঠানে। যে টাকাটা খোয়া গেল তা এই প্রতিষ্ঠানেরই।

এই ঘটনার কিছুদিন বাদে সঞ্জয় চাদরমুড়ি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাজির হলো মিতুর চেম্বারে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মিতু তড়িঘড়ি রক্ত পরীক্ষা করলো। পাওয়া গেল প্লাজমোডিয়াম ভাইভাক্স। নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়া। বোম্বাইয়ের মতো পরিচ্ছন্ন শহরে এনোফিলিন মশার উপদ্রব! অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাই বিস্মিত মিতু সঞ্জয়কে জিগ্যেস করলো, 'তুমি কী এর মধ্যে বাড়ি গিয়েছিলে?'

'না তো'।—অস্ফুট স্বরে বললো সঞ্জয়।

'কদ্দিন?'

'তা হবে মাস দু'-তিন।'

'তাহলে মশার কামড় খেয়েছো এখানেই। কারণ মশা-কামড়ানোর দিন থেকে জ্বর ও রক্তে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইটের আবির্ভাব হতে লাগে দশ-পনেরো দিন। যাক। এখন থেকে তুমি মশারি টাঙিয়ে শোবে। বোম্বাইয়ে ম্যালেরিয়া ঢুকেছে।'

সঞ্জয় স্বভাবসিদ্ধ বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আজ্ঞে না। এখানে যে বাড়িতে থাকি, সেখানে কোনদিন মশা দেখিনি। তবে হাসপাতালে কামড়ে থাকতে পারে।'

'হাসপাতাল! হাসপাতালে কেন?'—মিতু ভ্রূজোড়া কুঁচকে জিগ্যেস করল।

সঞ্জয় লজ্জিতমুখে বলল, 'অহো! একটা কথা বলা হয়নি। আহত অবস্থায় চ্যাং-দোলা ক'রে কয়েকজন আমায় ট্যাক্সিতে তুললো। গাড়ি ছুটতে লাগল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি তখন বিভ্রান্ত। জামা ছিঁড়ে গেছে। গা-হাত পা টনটন করছে। বাঁ হাতের কব্জির ওপরে যা একটু চোট। তাছাড়া তেমন কিছু হয়নি। নিজেকে একটু সামলে নিলাম। দেহ-যন্ত্রণার চেয়ে দুর্ভাবনায় আমি তখন কাতর। ঘামছি। অতগুলো টাকা। কৈফিয়তই-বা কি দেবো? ওঁদের তাই বললাম, 'না। হাসপাতাল যাব না। ভালই আছি। নামিয়ে দিন।' সঞ্জয় থেমে গেল।

'তারপর?'

'বলছি স্যার। এক গ্লাস জল—'

সঞ্জয় জল খেল। তারপর বলতে লাগল, 'একজন অনুকম্পার স্বরে বললেন, 'আহা! তা কী হয়? দুর্ঘটনা বলে কথা। ডাক্তার দেখানো দরকার।' আমি বলি, 'আমার ভাল ডাক্তার আছে। ছেড়ে দিন।' শুনে ওদের মুখে বাঁকা হাসি চল্‌কে পড়ল। একজন চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'বলছেন কী মশাই? আমাদের কর্তব্য বলে একটা জিনিস তো আছে। নিন, বড়িটা খেয়ে নিন। বেদনা কমে যাবে।'

'বুঝলাম, ওঁরা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেলাম। বড়িটা গিলে ফেললাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। চোখের পাতা দু'টো ভারি ভারি বোধ হলো। বাস, তারপর কী ঘটল জানি না।'

সঞ্জয়ের গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। ঢোঁক গিলল।

'জল খাবে?' মিতু জিগ্যেস করে।

'দিন।'

জল খেয়ে সঞ্জয় পুনরায় বলতে শুরু করল: 'জ্ঞান ফিরলে দেখি, বিছানায় শুয়ে আছি। শিরার মধ্যে টপাটপ রক্তের ফোঁটা ঢুকছে। হাত-পা খাটের সংগে বাঁধা। পিঠে-কোমরে কটকটানি। বুকের ভেতরটা শূন্যবোধ হলো। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে। গলা শুকিয়ে

কাঠ। এদিক-ওদিক তাকালাম। নজরে পড়ল, দু'জন ভীষণাকৃতি লোক। দরজার কাছে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'জল, জল।' ওরা হাসলো। জল দিল না।'

মিতু চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। সে বলল, 'হুঁ:। বুঝতে পেরেছি। পরিষ্কার। মশা-কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়নি। ঐ রক্তের মধ্যেই ছিল ম্যালেরিয়ার ভূত। দেখি, জামাটা তোল তো।'

পিঠে অস্ত্রোপচারের দাগ দেখে মিতু আঁতকে উঠল। 'এ কী! আঘাত তো সামান্য নয়!'

'নাঃ স্যার। বিশেষ কিছু হয় নি।' জড়িয়ে জড়িয়ে বলল সঞ্জয়। তার কণ্ঠের জড়তা যেন কাটছে না।

'তাই যদি হয়, অস্ত্রোপচারের দরকার হলো কেন?'

'তা তো বলতে পারবো না।'

'আচ্ছা, কোন্ হাসপাতালে ভর্তি ছিলে?'

'তাও জানি না।'

'সেকি! হাসপাতালের নাম জানো না?'—মিতু রীতিমত বিস্মিত।

'সত্যি বলছি স্যার। সুযোগ পাইনি। একদিন কাকভোরে ঘুম ভাঙল। মনে হলো গদিটা পাথরের মত শক্ত—সেঁতসেঁতে। চোখ মেলে তাকালাম—ওপরে নীল আকাশের চাঁদোয়া। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুঝলাম, ফুটপাতের ওপর শুয়ে আছি। মনের ভেতর ভয় জমাট বাঁধলো ধীরে ধীরে। ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করে উঠতে পারলাম না। ক্রমশঃ রোদ দেখা দিল। উঠে বসলাম। মাথাটা ভারি মনে হলো। একটি লোক দু'হাতে খইনি ডলতে ডলতে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। তাঁকে ডাকতে গেলাম, মুখে কথা সরলো না। তারপব একটা লজ্‌ঝড় কালো পুলিশের গাড়ি খোঁড়াতে খোঁড়াতে সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। মনে অল্প সাহসের সঞ্চার হয়। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। কোমরটা ঝনঝন করে উঠল। সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। কপাল-জোরে একটা ট্যাক্সি মিলে গেল।'

'তাজ্জব ব্যাপার! তোমার বাড়ির কেউ হাসপাতালে যায় নি?' জিগ্যেস করল মিতু।

'নাঃ। নাম-ঠিকানা বলেছিলাম। আসলে খবর পাঠানো হয় নি—না-বাড়িতে, না-অফিসে।'

'রাস্তায় দুর্ঘটনা। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে যায় নি ?'

'না তো।'

মিতু ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল। এমন সময় সঞ্জয় ওয়াক তুলল। তাকে ধরে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হলো। হড়হড় করে বমি করল সে। একটু আরাম বোধ করলে মিতু তাকে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে বলল, 'এখন বাড়ি যাও। সুস্থ হয়ে একদিন এসো।'

বেশ কিছুদিন বাদে। সন্ধে হয়-হয়। মিতুর চেম্বারে ঢুকলো সঞ্জয়। তার চোখ-মুখ যেন দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা মাখা।

'এখন কেমন ?'—মিতুর স্নেহ-কোমল স্বর।

'ভালই।'

'আচ্ছা, হাসপাতালের ছাড়পত্রটা এনেছো ?'

'দেয় নি, স্যার।'

'দেয়নি !' দারুণ চমকে উঠল মিতু। আচ্ছা, পাশের রোগীর কাছে তো হাসপাতালের নামটা জেনে নিতে পারতে।'

'সে সুযোগও পাই নি, স্যার। একটা কেবিনের মধ্যে আমি একলা পড়ে থাকতাম। বাইরে আসতে মানা। দিনরাত আমার উপর কড়া নজর।'

'ঠিক আছে। দাঁড়াও, তোমার এক্স-রে করি। দেখি কী পাওয়া যায়।'

এক্স-রে প্লেটে ধরা পড়ল বাঁ দিকের কিডনিটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। এমন-কি আঘাত যার জন্যে অস্ত্রোপচার ছিল জরুরী ? অথচ সঞ্জয়ের মতে আঘাত তেমন কিছু না। তাহলে ? গোটা ব্যাপারটা আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত বিচার করে মিতু স্থির সিদ্ধান্তে এল এটা ছিনতাই। কিডনি ছিনতাই।

'কেন দাদু ? কিডনি ছিনতাই কেন ?'—বীরুর কৌতূহলী প্রশ্ন।

দাদু গমগমে গলায় বললেন, 'লোভ। টাকার লোভ। কিডনির অসুখে মুমূর্ষু রোগীর দেহ থেকে অকেজো একটা কিডনি কেটে বাদ দিয়ে সেখানে একটা সুস্থ তাজা কিডনি প্রতিস্থাপন করলে অকাল-মৃত্যু রোধ করা সম্ভব। এ-রকম অস্ত্রোপচারকে ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে, ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন (**Transplantation**)। এ-ধরনের একটা সুস্থ নিখুঁত কিডনির বাজার দর হলো কয়েক লাখ টাকা।'

'তাহলে সঞ্জয়ের কিডনি ছিনতাই হলো কেন ?'—হীরুর সপ্রতিভ প্রশ্ন।

দাদু হেসে বললেন : 'শহরের দূষিত পরিবেশে মানুষের দেহ নানান

ব্যাধিতে কম জোরি হয়ে পড়ে। বয়স বাড়ার সংগে সংগে-ও হয়। তাছাড়া আলালের ঘরের দুলালদের হৃৎপিণ্ড, কিডনি, ফুসফুস ইত্যাদি নানান অত্যাচারে অকালে নষ্ট হয়ে যায়। তাই গ্রামের বিশুদ্ধ জল-হাওয়ায় যারা মানুষ, যারা গরিব ও অল্পবয়সী তাদের এগুলো অপেক্ষাকৃত সতেজ থাকে। এ-দিক থেকে বিচার করলে সঞ্জয় ছিল উপযুক্ত পাত্র।'

'কিডনির অভাবে সঞ্জয়ের তো মৃত্যু হতে পারে?'—বীরু জিগ্যেস করল।

'মানুষের থাকে দু'টো কিডনি। একটা কেটে বাদ দিলেও অপরটা দিয়ে কাজ চলে যায়। থাকেনা জীবনহানির কোন আশংকা।'

'তাহলে দাদু, আমাদেরও কিডনি তো ছিনতাই হতে পারে?'—সভয়ে জিগ্যেস করল হীরু।

দাদু আশ্বস্ত করে বললেন: 'হ্যাঁ, হতে পারে। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই। কিডনি পরিবর্তন করা মস্ত বড় অপারেশন। বিস্তর ঝামেলা। আনাড়ির দ্বারা সম্ভব না। ABO লোহিত কণিকার গ্রুপ অনুযায়ী কিডনি মেলাতে হয়। 'A' কিডনি 'B' গ্রাহকের দেহে ট্রান্সপ্লান্ট করলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। সংক্ষেপে, ব্লাড ট্রান্সফিউসানের আইন-কানুন মেনে চলতে হয়। এর জন্যে দরকার বিশেষজ্ঞ। বড় বড় হাসপাতাল ছাড়া অন্য কোথা এ-অপারেশন সম্ভব না। তাই কিডনি নিয়ে অনৈতিক ব্যবসার সুযোগ খুবই কম। তবে চোখ ছিনতাই হবার সম্ভাবনা প্রচুর।'

'দাদু, চোখ কেন ছিনতাই হবে?'—ঝট্ করে প্রশ্ন করল বীরু।

'কারণটা একই। লোভ। একটা চোখ উপড়ে আনতে পারলে কম করে হাজার পনেরো।'

'উপড়ানো-চোখ কী দরকারে লাগে?'—হীরুর কৌতূহল।

'চোখের কর্নিয়া প্রভৃতি প্রয়োজনীয় অংশ দৃষ্টিহীনের চোখে বসিয়ে তার দৃষ্টিশক্তি ফেরানো যায়। আমার কি মনে হয় জানিস?'

'কী দাদু?'

'মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে সোনার গয়না ছেড়ে ডাকাতদের নজর পড়বে মানুষের ঐ দুটো সোনামণির ওপর।'

'তাহলে?'

দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'যদি প্রাগৈতিহাসিক নিষ্পাপ দিন-গুলোতে ফিরে যেতে পারতুম!'

ছায়া মুর্তি

'কী ?—এফ. আই. আর !'—মুখে যুগপৎ বিরক্তি ও বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বললেন মিঃ জানকী প্রধান—হরিপুর থানার বড়বাবু। রীতিমত ধমক দিয়ে তিনি ফের বললেন, 'দেহে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করেছে—তা কী শোনেন নি ?'

'কিসের দুঃখে, বলতে পারেন ? আর আত্মহত্যাই যদি করে থাকে, সাত তাড়াতাড়ি সৎকার করা হলো কেন ? আমাদের একটা খবর পাঠান কী উচিত ছিল না ?'

'এ সবের কৈফিয়ৎ থানা দিতে বাধ্য না,—মশাই। এটা আত্মহত্যার ঘটনা—এই পর্যন্ত বলতে পারি।'—গলা চড়িয়ে বললেন বড়বাবু।

'হ্যাঁ ঠিক। ঠিক বলেছেন। আত্মহত্যাব ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়াই সুবিধে। সাক্ষী-সাবুদ যোগাড় করা, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটা খুনের মামলা দাঁড করানো—বহুত ঝামেলা। কী দরকার এত খাটনির। কী বলুন,বড়বাবু ?'

শুনে, বড়বাবুর মুখখানা লাল হয়ে উঠল। বেজায় খাপ্পা, লাফ দিয়ে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'আগে বলেছি, এখনো বলছি—আত্মহত্যা। ময়না তদন্ত রিপোর্টে তো তাই বলছে, মশাই। বাজে কথা খরচ করবার সময় নেই। বেরিয়ে যান।'

'হুঁঃ। ময়না তদন্ত! ওখানেও টাকার ফুলঝুরি। ঠিক আছে, যাচ্ছি।'

শোকে-দুঃখে-অপমানে আচ্ছন্ন অতনু রায় চোখের সামনে যেন দেখতে পেলেন, সীমার সর্বাঙ্গে লকলকে আগুনের শিখা। সীমা যে তাঁর একমাত্র সন্তান। ঘরে-বাইরে, নিদ্রা-জাগরণে—সব সময় মেয়ের স্মৃতিতে তিনি বিভোর। মেয়ের হাসি-হাসি মুখখানা আর ভাসা-ভাসা চোখজোড়া যেন এখনো জীবন্ত। এক বছরও হয়নি। বিয়ে হলো চিন্ময়ের সংগে। চিন্ময়ের আদুরে নাম, চিনু। দামী পাত্র বটে। সুদর্শন। সদ্য পাশকরা ডাক্তার। তার বাবা হীরালাল হলেন নাম-করা কন্টাকটার। মা মাধুরী যেন মাধুর্যে ভরা। সেকেলে ধরনের। পুজো-আচ্চা না করে জল খান না।

দোষের মধ্যে যা একটু শুচিবাই আছে। বোন সুরভী ওরফে সুভী বিবাহিতা। তবে স্বামী-পরিত্যক্তা। মুখরা। তার বাঁকা বাঁকা কথা বলার ধরনটা প্রথমে অতনুবাবুর পছন্দ হয়নি। তবে উঠতি বড়লোক, মস্তবড় হাল-ফ্যাসনের তেতলা বাড়ি, ঠাকুর-ঝি-চাকর, ছিমছাম সংসার—এসব দেখে তিনি লোভ সামলাতে পারেন নি। তাই মেয়ে পার করতে তিনি জমি-জমা যা ছিল সবই বিক্রি করে দিলেন। তাতেও কুলোয় নি। দু-লাখ টাকা কী মুখের কথা। অবসরপ্রাপ্ত একজন সরকারি কেরানির কাছে স্বপ্ন। তবুও অতনুবাবু হাল ছাড়েন নি। শেষে বসত-বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন এক মাড়োয়ারিকে—একেবারে জলের দরে। এতো করেও মেয়ে একটুকরো সুখের মুখ দেখতে পেল না। পৃথিবীর কোলে স্থান মিলল না। বাঁচার অধিকারটুকুও কেড়ে নিল। দারুণ আঘাত। প্রতিক্রিয়া তাঁর মনের গভীরে প্রবেশ করল। চরম নৈরাশ্যের শিকার হয়ে তিনি স্নানাহার ত্যাগ করলেন। আপন ভাগ্যকে কর্মফলের সংগে যুক্ত করে তিনি বিছানা নিলেন।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন দীপ্তিময় রায়। অতনুবাবুর মামাতো ভাই। গোয়েন্দা পুলিশের সর্বময় কর্তা। তাঁর আশ্বাস পেয়ে অতনুবাবু কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলেন।

ইতিমধ্যে হীরালালবাবুর সংসারে ঘনিয়ে এলো দুর্বিপাকের কালো ছায়া। ঠাকুর মহেশ আর চাকর গণেশকে জবাব দেওয়া হলো। তাদের জায়গায় বহাল হলো রমেশ ও দীনেশ। দু'জনারই জোয়ান চেহারা। লাজুক, নম্র, বিনীত ও মধুরভাষী।

হীরালালবাবু কাজকর্ম সেরে রোজই বাড়ি ফেরেন সন্ধের পর। সেদিন যথারীতি বাড়ী ফিরলেন। ডোর-বেল টিপতেই দীনেশ দরজা খুলে দিল। তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন। কয়েক ধাপ মাত্র উঠেছেন। এমন সময় হুড়মুড় করে একটা শব্দ হলো। সংগে সংগে বাড়ির আলোগুলো গেল নিবে। দীনেশ প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল: 'বাবু পড়ে গেছেন। শিগ্রি বাতি নিয়ে আসুন।'

মাধুরী ও সুভী তখন দূরদর্শনে নাটক দেখছিল। চ্যাঁচামেচি শুনে সুভী তড়াং করে উঠে পড়ল। অন্ধকারে হাতড়ে টর্চটা খুঁজতে একটু দেরি হয়ে গেল। আলুথালু বেশে দুদ্দাড় করে মা-মেয়ে নিচে নেমে দেখে—হীরালালবাবু সিঁড়ির নিচে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। একেবারে বেহুঁস।

পরক্ষণে বৈদ্যুতিক আলোগুলো জ্বলে উঠল। রমেশ উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এলো।

নার্সিংহোমে ডাক্তার হাজরা পরীক্ষা করে বললেন, 'মাথায় চোট। তবে সাংঘাতিক কিছু না।' চিকিৎসা চলতে লাগল। ঘন্টা-খানেক বাদে হীরালালবাবু চোখের পাতা খুললেন। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি। কয়েক ঢোক জলে গলাটা ভিজিয়ে নিলেন তিনি। ইসারায় মাধুরীকে কাছে ডাকলেন। ফিসফিস করে আড়ষ্ট গলায় কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। মাধুরী মুখের কাছে কান পেতে শুনলেন। মুহূর্তে তিনি যেন ভয়ে সিঁটিয়ে গেলেন। মুখের এনামেল পাংশু বিবর্ণ হয়ে গেল।

হীরালালবাবুর জ্ঞান ফিরল বটে। তবে তা কয়েক মিনিটের জন্য। আবার চোখ বুজলেন। ডাঃ হাজরা বললেন, 'হার্ট অ্যাটাক।'

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেলে মাধুরী একদিন চিনুকে কাছে ডাকলেন। ভয়-পাওয়া-ভাব চোখে ফুটিয়ে চাপাস্বরে তিনি বললেন, 'দেখ বৌমা ভূত হয়েছে।' পরে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তোর বাবা স্পষ্ট দেখেছে। আচমকা দেখেই মাথাটা ঘুরে যায়। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায়।' একটু থেমে ক্ষীণস্বরে তিনি বললেন, 'তুই তো বিশ্বাস করবি না। তবু বলছি, গয়াধামে পিণ্ডিটা দিয়ে আয়। তোর বাবা মৃত্যুর আগে বলে গেছে।'

ভ্রূ কুঁচকে ব্যাপারটা এতক্ষণ বোঝার চেষ্টা করছিল চিনু। মা'র কথা শেষ হতেই সে ফোঁস করে উঠল। উগ্র মেজাজে সে বলল, 'ও-সব অন্য লোক বিশ্বাস করবে। রোজ তো হাজার হাজার লোক মরছে। সবাই কী ভূত হয়ে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরচে? গাঁজা। কুসংস্কার।'

'তা হোক। তোর বাবার কথা রাখ। পিণ্ডিটা দিয়ে আয়।'

'বাজে খরচা। কতকগুলো বুজরুক ধান্দাবাজ এই করে আমাদের জাতটাকে—দেশটাকে ডোবাচ্ছে। এ-সব ধর্মীয় বিশ্বাসের কোন দামই নেই। অসভ্যতা। নোংরামি। নাঃ, মোটেই প্রশ্রয় দিতে পারি না।'

'অতো যদি সবজ্যান্তা, বাবার ছাদ্ধটা না করলেই পারতে।'—খোঁচা দিয়ে বলল সুভী।

'চুপ কর। বেহায়া।'—রুষ্টস্বরে বলল চিনু।

'কেন চুপ করবো? কী এমন দোষের কথা বলেছি যে 'বেহায়া' বললে?' সুভী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'তোর বাবা কী মিথ্যে বলবে? প্রেতের উদ্ধারের জন্য পিণ্ডি দিতে হয়।'—মাধুরী মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বললেন।

'প্রেত-ট্রেত ওসব বাজে। আসলে দেখার ভুল।'—মেজাজটা একটু নরম করে বলল চিনু।

'তোর বাবার কী চোখ খারাপ? ক'পয়সাই-বা খরচা? সময় ক'রে যা না।'

'আচ্ছা, ভেবে দেখবো'খন। যাই দেখি। বড়বাবু ডেকেছেন।' চিনু ক্ষিপ্র গতিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

'মা'—। খাবার দেবো? রাত্তির হলো যে—।' ব্যস্ত গলায় বলল রমেশ।

'ক'টা বাজে?'

'তা হবে, এগারোটা।'

'দিদিমণিকে খেয়ে নিতে বল। চিনু বড্ড দেরি করছে।' মাধুরী বাইরের বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'চোর! চোর!'—সুভীর জোর চিৎকার। সে হাতের কাচের গ্লাসটা ছুঁড়ে মারল। গ্লাসটা চোরের দেহের ভেতর দিয়ে গলে দেয়ালে আছড়ে পড়ল। ঝনঝন শব্দে টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। সে অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। কোন প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে সুভী আঁতকে উঠল। সে আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'ওমা ভূ—ত—।' ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল সে। মাধুরী দৌড়ে এলেন। তিনি সাহসে ভর করে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন—এক নারী মূর্তি। এক পিঠ এলোচুল। পরনে দুধসাদা শাড়ি, চওড়া লাল পাড়। দু'হাতে গহনা। মুখখানা লম্বাটে। মুখের আদল হুবহু বৌমার মতো। দাঁড়িয়ে আছে—স্তম্ভের মতো নিশ্চল, নিস্পন্দ। অমনি থরথরিয়ে কেঁপে উঠল মাধুরীর পায়ের পাতা। মাথাটা তাঁর চক্কর দিয়ে উঠল। টাল সামলাতে না পেরে তিনি পড়ে গেলেন। দাঁতে দাঁত লেগে যায়। এমন সময় হঠাৎ সব আলো গেল নিবে।

কিছুক্ষণ বাদে বৈদ্যুতিক আলোগুলো একসংগে জ্বলে উঠল। রমেশ ও দীনেশ ওদের মুখচোখে জলের ঝাপটা দিল। মাধুরী ও সুভীর জ্ঞান ফিরল। সুভী ধড়মড় করে উঠে বসল। বিস্ফারিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। ভূতের কোন অস্তিত্ব দেখতে পেল না। বিমূঢ় ভঙ্গিতে সে বসে রইল। মাধুরী এক ঢোঁক জল খেলেন। দেহ অবশ। মাথা ঝিমঝিম করছে। রমেশ ও দীনেশ তাঁকে ধ'রে বিছানায় শুইয়ে দিল।

ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই বাড়ি ফিরল চিনু। থমথমে আবহাওয়া দেখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সে। মা কোন কথা বললেন না। সুভী ঘটনাটা সব খুলে বলল দাদাকে।

শুনে, রাগে ফুঁসে উঠল চিনু। গলা সপ্তমে চড়িয়ে সে বলল, 'ডাহা মিথ্যে। যত্তোসব বোগাস। ভূত শুধু তোমরাই দেখতে পাও।' আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রমেশ কথা কেড়ে নিয়ে বিনীতভাবে বলল, 'হ্যাঁ দাদাবাবু। সব সত্যি। আমরাও দেখেছি, স্পষ্ট।'

'হাঁদারাম কোথাকার। ধরতে পারলি না?' ধমক দিয়ে বলল চিনু।

রমেশ আমতা আমতা করে বলল, 'কী ক'রে ধরবো দাদাবাবু? আলোগুলো যে নিবে গেল। আলো জ্বললে দেখি, হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সে।'

'যত্তোসব ভীরুর দল। ভূত না ছাই। আসলে চোর-টোর হবে।'

মাধুরী এবার উঠে বসলেন। প্রতিবাদ করে বললেন, 'নিজের চোখ দুটোকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না। আগেও বলেছি, এখনো বলছি—বৌমা ভূত হয়েছে।'

'কক্ষনো-না। কথায় বলে বুড়ো হলে বায়াত্তুরে পায়। এখন তোমার কাশী যাওয়া দরকার।'—কর্কশ কণ্ঠে বলল চিনু।

কথাগুলো একেবারে মাধুরীর আঁতে বিঁধে গেল। তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

'কথা বাড়িয়ে কী লাভ? বাবা-মা'র যখন ইচ্ছে, পিণ্ডিটা না হয় দিয়েই এসো না।'—ঈষৎ কঠোরভাবে বলল সুভী।

পিণ্ডির কথা উঠতেই, চিনু হঠাৎ ফেটে পড়ল। যেন আণবিক বিস্ফোরণ ঘটল। সে রক্তিম চোখে বলল, 'পিণ্ডির নিকুচি করেছে। তুই মেরেছিস, তুই দিগে যা।'

'কী বললে? আমি মেরেছি! মুখ সামলে। তুমি সাধু? মা সাক্ষী। মহেশ-গণেশ সাক্ষী।'—সুভী গাছ-কোমর বেঁধে উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল।

সুভীর গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে চিনু হেঁড়েগলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আলবৎ।'

সুভী হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। মাধুরীর ঠোঁটজোড়া থরথর করে কেঁপে উঠল। তাঁর অসহিষ্ণু গলা থেকে বেরিয়ে এলো, 'হারামজাদা। মুখের ভেতর কে কাপড় গুঁজে দিয়েছিল? গলা টিপে কে ধরেছিল? কালো মেয়ে বলে কে অনবরত খোঁটা দিত? এখন সুভীর ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে? তোর হুকুমেই তো ও গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়েছে। খবরদার। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো, জানিস।' মাধুরী মেঝের ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি।

পরদিন থানার বড়বাবু জানকী প্রধান গ্রেপ্তার করলেন চিনু আর তার বোন সুভীকে হত্যা ও সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপের অপরাধে।

'কেন দাদু? বড়বাবু তো 'আত্মহত্যা' বলেছিলেন।'—বীরু ধাঁ করে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

দাদু মুচকি হেসে বললেন, 'ওপর-মহলের চাপে বা টাকার থাপ্পড় খেয়ে পুলিশে ও-রকম বলে। প্রকৃতপক্ষে এটা খুনেরই ঘটনা।'

'চার দেয়ালের ঘেরাটোপের মধ্যে খুন। সাক্ষী সাবুদ কোথা? মামলা কী ধোপে টিকবে?'

দাদু চোখে ঝিলিক তুলে হাসলেন। বললেন, 'তা কেন টিকবে না? আসলে রমেশ ও দীনেশ ছিল গোয়েন্দা-পুলিশের লোক। দীপ্তিময় রায়ের নির্দেশমত ওরা ঠাকুর-চাকরের ছদ্মবেশে কাজ করছিল। সেদিন রাতের সব কথাবার্তা তাঁরা ধরে রেখেছিল জামার মধ্যে লুকানো উচ্চ শক্তিসম্পন্ন টেপরেকর্ডারে। তাছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে তো মহেশ-গণেশ রয়েছে।'

'ভূতুড়ে ব্যাপারটা কী সত্যি ?'—জিগ্যেস করল হীরু।

দাদু হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। বললেন, 'ব্যাপারটা তো ধরতে পারলি না। আসলে ওটা সীমার হলোগ্রামের ত্রিমাত্রিক ছবি। পর্দা ছাড়াই এই প্রক্ষেপণ (প্রজেকশান)। এর জন্য দরকার হলোগ্রাম প্রক্ষেপক (প্রজেক্টার) আর লেসার রশ্মি। এতে প্রক্ষেপণ বলে মনেই হবে না। মনে হবে আসল মূর্তি। গ্লাসটা মূর্তির ভেতর দিয়ে গলে গেল দেখে সুভীর ধারণা হয়েছিল—নিশ্চয়ই ছায়ামূর্তি; কোন কঠিন উপাদানে তৈরী না। দীনেশ সবার অলক্ষ্যে মূর্তিটাকে হাজির করত। ভয়ে যখন ওরা বেহুঁস হয়ে পড়ত তখন রমেশ মেন-সুইচ অফ্ করে দিত। অন্ধকারে মূর্তিটাকে সরাতে অসুবিধে হতো না।'

'ত্রিমাত্রিক ছবি কী ?'—হীরু জিগ্যেস করল।

'কেন ? তোরা 'ত্রিমাত্রিক সিনেমা'র কথা শুনিস নি ?'—বিস্মিতমুখে পাল্টা প্রশ্ন করলেন দাদু।

'হ্যাঁ।'—বীরু-হীরু ঘাড় নেড়ে বলল।

'তবে ? দৈর্ঘ ও প্রস্থের সংগে 'উচ্চতা' একই সাথে দেখানো হয় ফিল্মে। এতে ছবিকে জীবন্ত বলে মনে হয়। তবে এ-সব ছবি দেখতে হলে দর্শককে এক বিশেষ ধরনের চশমা পরে নিতে হয়। এর নাম পোলা-পাইজড্ চশমা।'

'তাহলে ওটা ছায়ামূর্তি ? ভূত নয়—'

দাদু বললেন, 'ঠিক তাই।'

নীলকণ্ঠ বাবার নীল বিষ

রহিম-চাচা গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'নীলকণ্ঠ-বাবা সত্যি সত্যিই 'নীলকণ্ঠ'। তবে ছাই, চন্নামেত্তর—ওসব বাজে।' পরে বুক বাজিয়ে তিনি বললেন, 'রহস্য আমি জানি। আসলে রোগ-টোগ উনি নিজের দেহে টেনে নেন। যেমন ক'রে হুমায়ুনের রোগ টেনে নিয়েছিলেন বাবর। তবুও অমন ভর-ভরন্ত চেহারা টসকায় নি এতটুকু। মেজাজটা একটু তিরিক্ষে এই-যা। তবে ঠিকঠাক পেন্নামি দিতে পারলে একেবারে সাক্ষাৎ 'আশুতোষ'। আলাই-বালাই সব সাফ চোখের পলকে।'

নির্বিরোধ শান্ত প্রকৃতির মানুষ বলে রহিম-চাচার সুনাম। সব সময় মুখের ওপর খুশির ছায়া। গুণীর সুখ্যাতি করেন পঞ্চমুখে। তবে চাচার ঐ একটা দোষ—মুখ খুললে আর সহজে থামতে চান না। পেটের কথা হড়-হড় করে বের করে দেন। মুখে কথার খই ফুটে। কোনো ক্লান্তি নেই। বকেশ্বর আর কি। তাই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা চাচা, কী কী রোগ সারতে দেখেছেন ?'

চাচা একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কত কী। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে নি। এক লেংড়া বাবু, হ্যাঁ ডান পা-টাই হবে। হাঁটুর নিচ থেকে বাদ দেওয়া। কাঠের পায়ে হাঁটতো। সটান পা-টা গজিয়ে গেল গা, বাবার ত্রিশূলের এক গুঁতোয়।'

'বলেন কী চাচা ?' চাচাকে উৎসাহিত ক'রে বললাম, 'তাহলে নীলকণ্ঠ-বাবা তো অবতার !'

'তবে আর বলছি কী ? যাও না, নিজের চোখে দেখে এসো না। রায়গড় তো এমন কিছু দূর না। এখান থেকে একেবারে নাকের সোজা। তেমাথায় নামবে। সোজা রাস্তা। মাইল খানেক। রিক্শা মিলবে। সে পাড়াগাঁ আর নেই। বাবার দৌলতে এখন পাকা পিচঢালা রাস্তা। দু'ধারে সারবন্দি দোকান। চা-টা সব মিলবে। ন্যায্য দামে। রাতে চোখ-ধাঁধনো বিদ্যুতের আলো।'

আরো কত কী বলতে যাচ্ছিলেন চাচা। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'তাহলে তো একদিন যেতে হয়। ঘুরে আসি। তারপর কথা হবে, কেমন ?'

নীলকণ্ঠ-বাবাকে দেখবার জন্য মনটা ছোঁক ছোঁক করতে লাগল। তাই একদিন বেরিয়ে পড়লাম। সংগে মিতু। টিকিট কাটলাম। রায়গড়ের নাম শুনে পাশে-বসা এক ভদ্রলোক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন। মাঝ-বয়সী। ভুরুজোড়া কপালে তোলা। চকিতে আমার আপাদমস্তক জরিপ করে নিলেন। ভারিক্কি চালে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছেন? আশ্রমে?'

'সে-রকমই তো ইচ্ছে।' সহজভাবে বললাম আমি।

ভদ্রলোক বিদ্রূপের স্বরে বললেন, 'যান, কলির অবতারকে, থুড়ি, সাক্ষাৎ মহাদেবকে দর্শন করে আসুন। জন্ম সার্থক হবে।'

'তাই নাকি।'

'দূর মশাই। ক্ষেপেছেন! আজকাল তো ঘরের আনাচে-কানাচে অবতার—মহাপুরুষ! মহাপুরুষের দর্শন পাওয়া এত সহজ? শেষকালে শ্রীঘরে। বুঝলেন, মশাই। ও-সব জারিজুরি কী আজকের দিনে চলে?'

ভদ্রলোক গায়ে পড়ে উপদেশ দিচ্ছেন দেখে আমি একটু বিরক্ত। নিন্দুকের স্বভাবই হলো পরের ছিদ্র খোঁজা। তবু নম্রভাবে জিগ্যেস করলাম, 'কেন? ওকথা বলছেন কেন?'

ভদ্রলোক উত্তেজিতভাবে বলতে শুরু করলেন, 'কেন বলবো না? পাঁচশো বার বলবো। জমিদার হরিমোহন রায়ের নাতি নীলমোহন রায় হয়ে গেল 'নীলকণ্ঠ-বাবা'। কলির কেষ্ট। জমিদারের রক্ত, বুঝলেন। শোষণ-পীড়নের দূষিত রক্ত। শোধন দরকার। সে কী আর দু-এক পুরুষে হয়?'

শুনে, খানিক হতোদ্যম হলাম। ঘাড় নেড়ে বললাম, 'তা বটে। তা বটে।'

সমর্থন পেয়ে ভদ্রলোক বেশ উৎসাহ বোধ করলেন। বেঢপ ভুঁড়িটা নাচিয়ে বললেন, 'আম গাছে জাম আর জাম গাছে আম। একী কোনকালে শুনেছেন?'

মনে হল ভদ্রলোকের মনে কোনো কারণে বিক্ষোভ জমে আছে। চুপ করে রইলাম।

ভদ্রলোক বললেন, হাজামজা জমিদার বংশে বাতি দিতে সবেধন নীলমণি ঐ নীলমোহন, থুড়ি 'নীলকণ্ঠ-বাবা'। বয়ে-যাওয়া ছোকরা। অনেকদিন ছিল ভিটে-ছাড়া। পড়ো বাড়িটা তো এ্যাদ্দিন পড়ে ছিল

চোর-ডাকাত, সমাজ বিরোধী, জুয়োর আড্ডা হয়ে। হঠাৎ ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব। এখন বিরাট আশ্রম বানিয়েছে। বাপ-ঠাকুর্দা একদিন গরিবগুলোকে ছারপোকার মতো পিষে মেরেছে। এখন উনি স্ট্রীম্ রোলার চালাচ্ছেন বড়লোক, মন্ত্রী আর এম্ এল. এ-দের ওপর। তা বেশ করছেন। তবে গরিবরা যে বাদ যাচ্ছে না। সব ভাঁওতা—বুজরুকি।'

আমি বলি, 'একটা-দুটো লোককে ধোঁকা দেওয়া যায়। সব লোক কী আর··· ?'

ভদ্রলোক যেন খিঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, দূর মশাই। কিস্সু বুঝলেন না। স্রেফ সম্মোহন। বাগানে ঢুকতে গেলেই নড়া ধরে আপনাকে দাঁড় করাবে একটা যন্ত্রের সামনে। সম্মোহন যন্তর, বুঝলেন। যাকে সম্মোহন করা যাবে না, তার কপালে জুটবে গলাধাক্কা আর গালি-গালাজ। আশ্রমে ঢুকলেই বুঝতে পারবেন। পকেট ফরশা। চিচিং ফাঁক।'

এমন সময় কনডাকটার চেঁচিয়ে উঠল; 'রায়গড়—তেমাথা—তেমাথা।' সচকিত হলাম। আমি আর মিতু নেমে পড়লাম।

আশ্রমে যাবার রাস্তা পাকা পিচঢালা। রিকশায় যেতে যেতে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলাম। রায়গড় নেহাত একটা এঁদো গ্রাম। আর পাঁচটা গ্রামের মতো সেখানে বনজঙ্গল, দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ আর বিল। মাঠে বালির পাহাড়। বিলগুলো নোংরা গোড়ালি-ডোবা জল নিয়ে শুয়ে আছে।

তখন কাঁটায় কাঁটায় চারটে। আমরা আশ্রমের দোরগোড়ায় পৌঁছলাম। সেখানে জনা-চারেক পাহারাদার। মারকুট্টে ভিলেনের মতো চেহারা। আমাদের পোর্টফোলিও ব্যাগ দুটো জমা রাখলো ওরা। মেটাল ডিটেক্টর (ধাতু নির্ণয়কারী যন্ত্র) দিয়ে আমাদের ওপর জোর পরীক্ষা চালানো হলো। একজন হাতে ধরিয়ে দিল একটা রঙীন চিরকুট। এটা নাকি অনুমতি-পত্র।

আশ্রমটি গাছ-গাছালিতে ঢাকা। ঝিরঝিরে বহে-যাওয়া হাওয়ায় বেশ আরাম বোধ করলাম। রাস্তাগুলো বেশী চওড়া না। পিচঢালা। ঝকঝকে। গাছপালা মন্দির বাড়িঘর—সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য দৃশ্য। বেশ রমণীয় শান্ত পরিবেশ।

প্রথমেই আমরা চললাম মন্দিরের দিকে। মস্ত বড় মন্দির। প্রায় তিনতলা সমান উঁচু। আগাগোড়া শ্বেতপাথরে তৈরী। মন্দির-চূড়ায় একটা ত্রিশূল। রোদে রুপোলি আলো যেন চারদিকে ঠিকরে পড়ছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে মাথা-পিছু প্রণামী দিতে হলো দশ টাকা আর আরো বিশ টাকা করে 'দিব্যচক্ষু'র জন্যে। বিগ্রহ নাকি চর্ম-চক্ষু দিয়ে দর্শন করা যায় না। তাই এই দিব্যচক্ষুর ব্যবস্থা। নাড়াচাড়া করে বুঝলাম, ওটা পোলারাইজড্ চশমা। ব্যাপারটা তখন আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না।

ভিতরে ঢুকে দেখি, অবাক কাণ্ড। মন্দির না, একটা মস্তবড় প্রেক্ষাগৃহ। বিভিন্ন বয়সের মেয়ে-পুরুষ গিজগিজ করছে। তারা দাঁড়িয়ে আছে জোড়হাতে রুদ্ধশ্বাসে। সবাই অপলক দৃষ্টিতে ঠাকুর দর্শন করছে।

দশাসই শিবের বুকের ওপর নৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন করাল-বদনা কালী। বিদ্যুৎ-চমকের মতো তাঁর চক্ষু-কোটর থেকে বেরোচ্ছে আগুনের ফুল্‌কি। মনে হলো আগুনের টুকরো বুঝি গায়ে এসে পড়বে। শিবের বিস্তৃত বক্ষে কৃষ্ণবর্ণ চকচকে এক বিরাট সাপ। বিশাল সুন্দর ফণা বিস্তার করে সে দোল খাচ্ছে হিসহিস শব্দে। এক এক সময় মনে হচ্ছে, এই বুঝি ছোবল মারে। কিছুক্ষণ বাদেই দেখি শিবকালীর মূর্তি উধাও। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি। চারধারে নৃত্যরত ব্রজাঙ্গনরা বনবন করে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাঁদের রঙ-বেরঙের পোশাক বেশ জমকালো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। পরমুহূর্তে দৃশ্যপট বদলে গেল। দাঁড়িয়ে আছেন এক সন্ন্যাসী। সৌম্য ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। মাথাভর্তি জটাজাল। কপালে লাল টিপ। মুখে লম্বা দাড়ি-গোঁফ। কাঁচা-পাকা। পরনে লাল টকটকে কাপড়, লুঙ্গির মতো পরা। গায়ে আলখেল্লা। রক্তবর্ণ। পায়ে খড়ম। বাঁ হাতে সিঁদুর-মাখা একটা ত্রিশূল। ইয়া লম্বা। চোখ দিয়ে যেন ঝরে পড়ছে করুণার অমৃত ধারা। মূর্তি নড়েচড়ে উঠল। দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ ও অভিভূত। সন্ন্যাসী তাঁর' পেশীবহুল ডান হাতটা ওপরের দিকে তুললেন অভয়ের ভঙ্গিতে। অমনি মন্দির প্রকোষ্ঠ নীলকণ্ঠ-বাবার জয়ধ্বনিতে মুখরিত হলো।

'তাহলে দাদু, ত্রিমাত্রিক সিনেমা দেখলেন তো।'—ফিক করে হেসে বলল বীরু।

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস।'—বললেন দাদু।

'এ-রকম ত্রিমাত্রিক ছবি দেখানোর উদ্দেশ্য কী?' জিগ্যেস করল হীরু।

'সাধারণে তো বুঝতে পারবে না ব্যাপারখানা। ফলে বাবার প্রচার বেড়ে যাবে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলে। এই আর-কি।'

অতঃপর আমরা বাগিচা দেখতে গেলাম। প্রবেশদ্বার লতা-গুল্মে আচ্ছাদিত। নয়নরম্য। সেখানে দু'টো সাইন বোর্ড ঝুলছে। একটিতে বড় বড় হরফে লেখা—'দিব্য কানন'। অপরটিতে লেখা—'গাছে হাত দেওয়া নিষেধ'। বাগিচায় ঢোকবার সময় আবার পরীক্ষা। আমাকে দাঁড় করানো হলো একটি যন্ত্রের সামনে। তখন বাসে সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল—'সম্মোহন যন্ত্র'। দেখি, যন্ত্র থেকে দুটো ইলেক্‌ট্রোড্ তার ঝুলছে। তাজ্জব ব্যাপার। সামনে দাঁড়াতেই যন্ত্রের কাঁটা প্রচণ্ড রকম দুলতে শুরু করল। অমনি উদ্যান-রক্ষক বিশাল থাবা মুঠো করে তেড়ে এলো। ষণ্ডার মত চেহারা। রুক্ষস্বরে বলল সে, 'খুনী, বেরিয়ে যান।' চরমভাবে অপমানিত বোধ করলাম। লোকটির স্পর্ধা দেখে আমার মাথা গেল গরম হয়ে। রাগে গা রি-রি করে উঠল। মিতু আমাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে গেল। চাপা গলায় সে বলল, 'তোর কী কোন কু-মতলব ছিল?'

'আম গাছে যদি জাম দেখি', আমি বললাম, 'তবে কয়েকটা ছিঁড়ে নিতাম।'

মিতু হেসে বলল: 'যন্ত্রটি আসলে সাইকো-গ্যালভ্যানোস্কোপ। গাছের কোন রকম ক্ষতি করবার কথা চিন্তা করলে ওরা তা বুঝতে পারে। ভয়ে তখন কাঁপতে শুরু করে। সেই উত্তেজনায় গাছের দেহকোষে বৈদ্যুতিক পরিবর্তন হয়। সামান্য বৈদ্যুতিক হেরফের ঘটলে কাঁটা দুলে ওঠে। ওসব মতলব ছাড়।'

আমরা আবার গেলাম। এবার কিন্তু যন্ত্রের কাঁটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখানে দর্শনী লাগল পাঁচ টাকা। আমরা ঢুকে পড়লাম। বিরাট জায়গা জুড়ে এই বাগিচা। আম জাম নিম বকুল দেবদারু প্রভৃতি ছোট-বড় গাছ-গাছালির সমারোহ। কাঁচা আনাজের সবুজ বিপ্লবের ছায়াছবি বেশ প্রকট। এদিক-ওদিক ঘুরে সব দেখতে লাগলাম। হঠাৎ একটা ছোট গাছ আমার নজর কেড়ে নিল। পাতা আম গাছের মতো। থরে থরে কালো জাম আঙুরের মতো ঝুলছে। নিচে কয়েকটা পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। লোভ সামলাতে পারলাম না। কুড়িয়ে নিয়ে টপাটপ মুখে পুরে দিলাম। আঃ কী অপূর্ব স্বাদ। বিস্ময়ে তাক্ লেগে গেল।

আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। নজরে পড়ল একটা পাকা আম। রাস্তার ওপর পড়ে আছে। পাখিতে ঠুকরানো। রস মাটিতে চুঁইয়ে পড়ছে। এক ঝাঁক মাছি সেটাকে ছেঁকে ধরেছে। ওপর দিকে তাকালাম। সবিস্ময়ে দেখি, গাছটা জামের। ডালে ডালে কাঁচা-পাকা আমের মেলা। অদূরে, গোটা-কতক নধর বেগুনি রঙের বেগুন ফলেছে। গাছগুলো কিন্তু ভেরেণ্ডার!

অতঃপর আমরা ফুল-বাগানে ঢুকলাম। সেখানেও সেই একই কাণ্ড। গোলাপ গাছে টকটকে লাল জবা। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মিতুর দিকে তাকালাম। তার চোখে মৃদু হাসির ঝিলিক। ব্যাপারটা সে খুলে বলল:

'এর মধ্যে অলৌকিক বলে কিছু নেই। পুরো ব্যাপারটা পড়ে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশলের আওতায়। প্রাণীর মতো উদ্ভিদের দেহকোষে আছে ক্রোমোজোম। এর ভেতর থাকে অসংখ্য জিনকণা। জীবদেহের এক-একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে এ-সব জিনকণা। সন্তান-সন্ততি জিনকণা পায় পিতামাতা উভয়ের কাছ থেকে। এভাবে প্রতিটি উদ্ভিদ বা প্রাণী বংশ-পরম্পরায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। প্রাকৃতিক নানা কারণে জিন সজ্জার হেরফের ঘটে।'

মিতু বলছিল: 'সেজন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর গুণাগুণের কিছু কিছু অদল-বদল হয়। বৈজ্ঞানিকরা এই পরিবর্তন ঘটাবার কলাকৌশল আবিষ্কার করেছেন। এটা দু'ভাবে করা হয়। একটা হলো গুণাগুণযুক্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে মিলন বা সংকর প্রক্রিয়ার দ্বারা। অপরটা হলো, এক উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহকোষ থেকে প্রয়োজনীয় জিনকণা তুলে নিয়ে অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোষে বসিয়ে দেওয়া। এই পদ্ধতিকে বলে, জিন প্রকৌশল।

মিতু থামল। আবার বলতে শুরু করল: 'জিনকণা তৈরী হয় ডি. এন. এ. নামে এক প্রকার বস্তু দিয়ে। জেমস ওয়াটসন আর ফ্রান্সিস ক্রীক নামে দু'জন বিজ্ঞানী ডি. এন. এ.-এর গঠন কৌশল আবিষ্কার করেন ১৯৫৩ সালে। নতুন জাতের উদ্ভিদ তৈরী করা হয় এই গঠনের অদলবদল ঘটিয়ে। জিন-প্রকৌশল পদ্ধতিতে নীলকণ্ঠ-বাবা যেভাবে উদ্ভিদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, এবার সেটা বলি:

'প্রথমে একটি পাত্রে রাখা হয় কোন উদ্ভিদের কিছু কোষ। কোষগুলি বেড়ে তৈরী করে কোষপিণ্ড বা ক্যালাস (Callus)। তারপর উৎসেচক

দ্রবণে রাখা হয় কোষপিণ্ডের কিছু অংশ। তাতে গলে যায় কোষ-প্রাচীর। থাকে শুধু ভেদনযোগ্য এক পাতলা আবরণ। এ-রকম কোষের নাম হলো প্রোটোপ্লাস্ট (Protoplast)। এবার যে প্রকার গুণাগুণযুক্ত জিনকণা এই কোষে ঢোকাতে চাই, তাকে প্লাজমিড (Plasmid) নামে এক ধরনের বাহকের সংগে জুড়ে দেওয়া হয়। তারপর জিন সমেত প্লাজমিড প্রোটো-প্লাস্টের সংগে মিশিয়ে দেওয়া হয়। প্রোটোপ্লাস্টের পাতলা পর্দা ভেদ করে জিনযুক্ত প্লাজমিড ঢুকে পড়ে কোষের ভিতর। তা থেকে নতুন জিন মিশে যায় কোষের জিন সজ্জায়। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রোটোপ্লাস্টের ওপর গড়ে ওঠে কোষ-প্রাচীর। এবার এতে বৃদ্ধি উদ্দীপক হরমোন প্রয়োগ করলে গজাতে শুরু করে শেকড় আর পাতা। অর্থাৎ একটা চারা গাছের সৃষ্টি হয়। তারপর গাছটিকে পুঁততে হয় মাটিতে খুব সাবধানে। সেখানে সে আলো-বাতাস পেয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে আরম্ভ করে। এভাবেই নীলকণ্ঠ-বাবা তৈরী করেছেন নতুন জাতের উদ্ভিদ।'

সন্ধ্যা প্রায় কোল ছুঁয়েছে বাগিচার। ঝাঁকে-ঝাঁকে মশার আক্রমণ শুরু হলো। অতিষ্ঠ হয়ে আমরা 'দিব্যকাননে'র বাইরে চলে এলাম।

মন্দির-সংলগ্ন একটি সজ্জিত বিপণি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেখানে দেখি দেশী-বিদেশী লোকের জটলা। ভস্ম ও চরণামৃত প্রভৃতি কেনবার জন্য ভিড়। মিতু এক প্যাকেট ভস্ম কিনলো। এতে নাকি বহুমূত্র রোগ সারে।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'খামোখা টাকাটা জলে ফেললি তো।'

মিতু ছেলেমানুষের মতো হেসে বলল, 'দেখা যাক সাপ-ব্যাঙ কী আছে।'

'ছাই খেলে কী রোগ সারে?' জিগ্যেস করল বাবু।

দাদু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'নাঃ, তা সারে না। তবে পরে রাসায়নিক পরীক্ষায় ছাই-এর মধ্যে পাওয়া যায় ক্লোরপ্রোপামাইড আর মেট্‌ফরমিন। দু'টোই বহুমূত্র রোগের কার্যকর ওষুধ।

বৈজ্ঞানিক কর্মশালার কর্ণধার নীলকণ্ঠ-বাবাকে দর্শন করবার জন্যে আমি আগ্রহ প্রকাশ করলাম। মিতু বলল, 'চ তবে, মুখোশটা খুলে দিয়ে আসি।'

অতঃপর আমরা গেলাম 'মোক্ষভবনে'। দিব্যকাননের একপাশে বিরাট বাড়ি। দোতল। মোটা মোটা থামওলা, সেকেলে ধরনের।

হালফিল রঙ-করা। সদর দরজার কাছে যেতেই দু'জন প্রহরী আমাদের পথ আটকালো। আমাদের শুঁকানো হলো গন্ধ-বিশারদ কুকুর দিয়ে। নিরাপত্তার এত কড়াক্কড়ি দেখে আমরা বিব্রত বোধ করলাম।

ধীর-পদক্ষেপে ঢুকলাম একতলার একটা হলঘরে। দরজা দেখে মনে হলো বর্মা-সেগুনের। নকশা-করা। ছাদে কাঠের কড়ি-বরগা দেখে চোখে বিসদৃশ ঠেকল। দেয়ালে আঁটা টিউব-লাইটের আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ঘরটা জুড়ে মোটা ফরাস পাতা। বসে আছেন বাবার গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দ যেন তাঁর কৃপাভিখারি হয়ে। নিস্তব্ধ। দৃষ্টি তাঁদের সামনে মঞ্চের ওপর একটা ঢাউস আরাম কেদারার দিকে। গদি আঁটা। ঘরের বড়বড় খড়খড়ি জানলাগুলো খোলা। ঘরের মধ্যে অগুণতি টবে তুলসী গাছের নৈবেদ্য সাজানো। আমরা মঞ্চের ওপর উঠলাম। সেখানে কিন্তু জ্বলছে চল্লিশ পাওয়ারের একটা বাতি টিমটিম করে। চেয়ারের রুজুরুজু ছাদে একটা শামিয়ানা টাঙানো। চেয়ারটা হাত দিয়ে দেখছি, অমনি হুট করে এগিয়ে এলো বাবার এক চেলা। রোগা টিঙটিঙে, ঢেঙা। পরনে হাফপ্যান্ট আর বুশশার্ট। খকখক কাশির ধকল সামলে সে বলল, 'দেখছেন কী মশাই? 'উড়ুক্কু কেদারা'। লোহার। দেখুন না, কত ভারি।'

নেড়েচেড়ে দেখলাম। সত্যিই লোহার। বেশ ভারি।

হাত-পা নেড়ে লোকটি ফিনফিনে গলায় কথার তুবড়ি ছোটাতে লাগল:

'অহো! বাবার কী ক্ষেমতা। চেয়ারে বসতে যা দেরি। ব্যস, হেলিকপ্টার। হুস। দেখতে পাবেন। এই দেখুন, আমার ডান পা-টা। হাঁটুর নিচ থেকে কেটে বাদ দেওয়া ছিল। কাঠের পায়ে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতাম। আহা! বাবার কী দয়া। কী ক্ষেমতা! ত্রিশূলের এক গুঁতো দিয়ে···।'

আমরা মঞ্চ থেকে নেমে পড়লাম। ফরাসের ওপর বসলাম একেবারে সামনের সারিতে। পাশের এক ভদ্রলোক এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'দেখছেন, বাবার কী আশ্চর্য শক্তি! বাইরে মশার ভ্যানর ভ্যানর। এখানে একটাও নেই। অহো! বাবার কী মহিমা!'

মিতু হেসে বলল, 'হুঁঃ। মশাও বাবার যো-হুকুমের দলে।' পরে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তুলসী গাছের মহিমা

রে।' এমন সময় নীলকণ্ঠ-বাবা মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। দীঘল দেহ, টানাটানা চোখ, নিটোল চিবুক—সব মিলিয়ে একরকম দৃঢ় ব্যক্তিত্বের দীপ্তি। কেমন যেন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘরসুদ্ধু সবাই একে একে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালেন। পায়ে হাত দেওয়া নাকি বারণ। তাই ধুলো খেতে কেউ আর ঝাঁপিয়ে পড়লেন না। আমরা উদগ্রীব হয়ে বসে রইলাম। প্রণামপর্ব শেষে বাবা চেয়ারে বসলেন। পা দুটো মুড়ে। আলোগুলো হঠাৎ গেল নিবে। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হলো না। পরক্ষণে বাবার মাথার ওপর ছাদ থেকে লাল-আলোর ফোকাস পড়তে লাগল। তাঁর রক্তবর্ণ পোশাকে লাল-আলো যেন সর্বাঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হবে, অলৌকিক। তারপর ঢেঙা লোকটি চেয়ারটাকে ওপরের দিকে একটু ঠেলে দিল। ব্যস, বাবাকে নিয়ে চেয়ারটা প্রায় হাত-চারেক উঁচুতে। বাবা যেন ধ্যান-নিমগ্ন। দেহ নিস্পন্দ। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর 'হর হর হর ; ব্যোম ব্যোম। জয় বাবা নীলকণ্ঠ'—কলরোলে খান-খান হয়ে ছাদ ভেঙে পড়বার উপক্রম। আমরা মঞ্চের কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখি, শামিয়ানা খোলা। একপাশে ঝুলছে। বাবার ঠিক মাথার ওপর একরাশ যন্ত্রপাতি। কড়ি-বরগার সাথে সাঁটা। ব্যাপারখানা বুঝতে দেরী হলো না। বাইরে বেরিয়ে এলাম।

'তাহলে ব্যাপারটা কী সত্যি ?'—জিজ্ঞেস করল বীরু। 'ওই চেয়ারটা, মানে বাবার শক্তিতে…।' ঢোঁক গেলল বীরু।

'দূর বোকা।'—ধমক দিয়ে বললেন দাদু : 'এখানেও বিজ্ঞানের ভেল্কি। পুরো ব্যাপারটা বৈদ্যুতিক চুম্বকের কারসাজি। কয়েকটা বিদ্যুৎ চুম্বক ছাদে বসান ছিল। লোকের নজর এড়াতে যন্ত্রপাতিগুলি লুকিয়ে রাখা ছিল সামিয়ানার আড়ালে। চেয়ারটা লোহার। ঢেঙা লোকটি চেয়ারটা ওপর দিকে একটু ঠেলে দিয়েছিল। ব্যস, লোহা বিদ্যুৎচুম্বকের আকর্ষণের মধ্যে এসে গেল। অমনি চেয়ার সমেত বাবা ওপরে উঠে গেলেন। আর বাবার ধ্যানট্যান—ওসব ভড়ং।'

'ওই ঢেঙা লোকটির পা তো কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ত্রিশূলের গুঁতো খেয়ে কী গজাতে পারে ?' এবার হীরুর জিজ্ঞাসা।

হো হো করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন দাদু। বললেন, 'পাগল ! মানুষ কী গাছ ? স্রেফ প্রচার। আসলে লোকটির পা কাটা যায়নি।

আমরা খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি। পা গজালেও, কাটা-ছেঁড়ার দাগ তো মুছে যেতে পারে না। গোড়ালি ও দাবনায় দগড়া দগড়া দাগ আর মালাইচাকির উপর কালসিটে দেখে বোঝা গেল—লোকটি পা-টা মুড়ে দাবনার সংগে গোড়ালি আচ্ছা-কোষে বেঁধে রাখতো। কাঠের পায়ে হাঁটতো একটা ঢিলে পাজামা পরে। তাই সাধারণে বুঝতে পারতো না। তাছাড়া নতুন পা গজালে তু'পায়ের লোম ও নখের তো কিছু হেরফের ঘটতো।

'তারপর দাত্ব?'

'তারপর আমরা আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলাম। রিক্সায় ফিরছি। কিছুটা দূর এসেছি। এমন সময় বুকফাটা কান্নার আওয়াজ। রিক্সা-অলাকে গাড়ি থামাতে বললাম। কান্নার কারণ জিগ্যেস করায় সে শোনাল এক করুণ কাহিনী।

'আর বলেন কেন, বাবু? ওরা সব শেষ হয়ে গেল। তু'চার ঘর ছাড়া বাকী সব্বাই পালিয়েছে। ওরাই শুধু মাটি কামড়ে পড়ে আছে এখনো। কুকম্মের ফল বাবু, কুকম্মের ফল।'

'কী ফল রে?'—আমি জিগ্যেস করি।

'ব্যামো বাবু, ব্যামো। বাবার অভিশাপ। বোধ হয় এখনই একজন অক্কা পেয়েছে।'

'বাবার অভিশাপ! সে আবার কী?'

'হ্যাঁ বাবু, সত্যি। এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি। দোষ, ঐ আদি-বাসীদেরই। আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে গাঁয়ের মাতব্বররা। জমিগুলো বাবার। ওরা করলো জবরদখল। রাতারাতি ছিটে বেড়ার ঘর বানালো। তা হবে ত্রিশ-চল্লিশ ঘর। বাবা ভাল মুখেই উঠে যেতে বলেছিলেন। ওরা কী তা শুনলো? তীর-ধনুক নিয়ে বাবাকে ঘেরাও করে রেখেছিল পাক্কা পাঁচ ঘণ্টা। মাতব্বরদের উস্কানি, বুঝলেন, বাবু। তাইতো আশ্রমে ঢোকা নিয়ে কড়াকড়ি।'

'তা তো বুঝলুম। তারপর?'

'তারপর যা হয়। মাথা নিচু করতে হলো বাবাকে। জমি ছেড়ে দিতে হলো। তবে তিনি শাপ দিলেন, শক্ত ব্যামোয় সব লোপাট হয়ে যাবে। এখন ওরা ঠেলা সামলাক।'

কেমন যেন খটকা লাগলো। তাই খোঁজ নিতে আমরা এগিয়ে গেলাম। রাস্তা থেকে শ' খানেক হাত দূরে। আল রাস্তা। মাঠ তখন ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। চকবন্দী ছিটেবেড়ার ঘর। খড়ের চাল। উঠানে এক জোয়ান ছোকরার মৃতদেহ। তাকে ঘিরে এক গাদা মেয়ে-পুরুষ কান্নাকাটি করছে। ওদের একজনকে মৃত্যুর কারণ জিগ্যেস করলাম।

সে যা বললো, তার সারমর্ম হলো : 'লোকটি অনেকদিন ধরে হাঁপের অসুখে ভুগছিল। কোনো ডাক্তার সারাতে পারেনি। এ-রকম রোগে আগে অনেকেই মারা গেছে। আরো নানান ধরণের অসুখ-বিসুখ ওদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বাবার সংগে গণ্ডগোল হবার পর থেকেই এ-সব সাংঘাতিক রোগের শিকার হয়েছে তারা। ওদের মতে ডান, ডানে খাচ্ছে। তাই ভয়ে বহুলোক ভিটে ছাড়া।'

যে ক'জন ওখানে উপস্থিত ছিল, তাদের সবাইকে পরীক্ষা করল মিতু টর্চের আলো ফেলে। কয়েকজনার হাতে-পায়ে এক ধরনের চর্মরোগ—অ্যালার্জিক ডারমাটাইটিস।

মিতু তারপর চারপাশটায় টর্চের জোরালো আলো ফেললো। অবাক কাণ্ড। আগাছায় ছেয়ে গেছে জায়গাটা। কতকটা গাঁদা গাছের মতো দেখতে। লম্বায় দেড়-দু'ফুট। বোঁটা বিহীন নাকছাবির মতো ফুলের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

আমরা ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম—আগাছাগুলো আগে ওখানে ছিল না। বাবার সংগে জমি নিয়ে বিবাদ হবার পরই জন্মেছে। ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হলো না। তড়িঘড়ি সরে পড়লাম।

'অভিশাপে কী কারো অসুখ হয় ?' জিগ্যেস করল বীরু।

'অভিশাপ না ছাই।' বললেন দাদু : 'এখানেও বিজ্ঞানের ভেল্কি। আগাছা থেকেই রোগের উৎপত্তি।'

'কী গাছ দাদু ?'

'ওই আগাছাগুলো আসলে 'জিপসি ঘাস' যার বৈজ্ঞানিক নাম হলো 'পার্থেনিয়াম হিস্টেরো ফোরাস'। পার্থেনিয়ামের পাতা দারুণ বিষাক্ত। গায়ে লাগলে চুলকানি, একজিমা প্রভৃতি চর্মরোগ হয়। এর জন্যে দায়ী 'পার্থেনিন' নামে একপ্রকার বিষ। ফুলের গন্ধ শুঁকলে হাঁপানি হতে পারে।

ডাক্তারি শাস্ত্রে নিরাময়ের কোন ওষুধ নেই। তবে সকলেরই যে রোগ হবে, তা না। যারা বেশী সংবেদনশীল তাদেরই ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। তাছাড়া পার্থেনিয়াম জমির নাইট্রোজেন শুষে নেয়। তাই জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—বাবার চেলারা পার্থেনিয়ামের বীজ ছড়িয়েছে আদিবাসীদের উৎখাত করবার জন্যে।'

'পার্থেনিয়ামকে ধ্বংস করার উপায় কী?'

দাদু বললেন, 'গবেষণা চলছে। ২, ৪ ডাইক্লোরো-ফেনক্সি-অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড' নামে এক জাতীয় রাসায়নিক বিষ পার্থেনিয়াম নির্মূল করতে পারে। তাছাড়া 'বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল' পদ্ধতিতে 'ক্যাসিয়া সেরেসিয়া' নামে কাসুন্দ শ্রেণীর বীজ ছড়িয়ে পার্থেনিয়াম বিনষ্ট করা সম্ভব। বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ মাটির সব রস টেনে নেয়। ফলে পুষ্টির অভাবে বিষাক্ত পার্থেনিয়ামের বংশ লোপ পায়।'

'আগুনে পুড়িয়ে দিলে হয় না?' ছটফটে গলায় প্রশ্ন করল বীরু।

দাদু বললেন. 'সবচেয়ে সোজা। তবে নীলকণ্ঠ-বাবা যদি আবার বীজ ছড়ান। তখন?'

'এই-সব মারাত্মক লোকগুলোর সাজা হওয়া উচিত?'

'কে সাজা দেবে?'

'আমরাই দিতে পারি। মানে জনগণ। নইলে সরকার।'

'আমি সেইদিনের অপেক্ষা করছি রে।'

দাদুর মুখে বেদনার ছায়া ঘনিয়ে উঠল।

ভস্মলোচন ইন্দ্রজিৎ ও বিজ্ঞান

'জানো দাদু, দিদা খ—উ—ব চাপা। অনেক পেড়াপেড়ি করে তবে গপ্প বের করলাম। তা—ও মাত্তর দুটো।' অনুযোগের সুরে বলল বীরু।

'কী গপ্প?' দাদু জানতে চাইলেন।

'স্রেফ আজগবি।' বলল বীরু।

'তা হোক। কিছু সত্যি তো থাকতে পারে।'

বীরু বলল, 'না, না। একেবারে আজগবি। ভস্মলোচন ছিলেন এক দুর্দান্ত যোদ্ধা—সেই রামায়ণের যুগে। তিনি নাকি যারই দিকে তাকাতেন সেই-ই পুড়ে ছাই হয়ে যেত। তাই তাঁর চোখ দুটো সব সময় চামড়ার ঠুলি দিয়ে ঢাকা থাকতো। তিনি গেলেন শ্রীরামচন্দ্রের সংগে লড়াই করতে। তাঁকে দেখে শ্রীরাম দর্পণ-অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। অমনি সব বানর সেনার মুখ দর্পণে ঢাকা পড়ে গেল। শ্রীরাম নিজে-ও দর্পণে আচ্ছাদিত হলেন। রাম-সমীপে এসে ভস্মলোচন চোখের ঠুলি খুলে ফেললেন। দর্পণে নিজের মুখ দেখে ভস্মালোচন নিজেই তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে গেলেন। এ-রকম গপ্প আজকের দিনে লোকে গাঁজা বলে উড়িয়ে দেবে না?'

'না রে। অস্বাভাবিক কিছু না। অধুনা বৈজ্ঞানিক যুগে এ-যে বাস্তব সত্য।' বললেন দাদু।

'সে কী!' বীরু বিস্ময় প্রকাশ করল।

দাদু হাসলেন। নিঃশব্দে। বললেন, 'ভস্মলোচন যে দিকে তাকাতেন সেদিকে যে থাকতো, সেই-ই ভস্ম হয়ে যেত, তা সে দূরে থাকলে-ও। এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে, তাঁর চোখ দিয়ে এক বিশেষ প্রকৃতির আলো বের হতো। রশ্মিগুলি দূরে গেলে-ও, তীব্রতা কমে যেত না। বরং সমানই থাকতো। সাধারণ আলোক-রশ্মিগুলি কিন্তু এ-রকম না। যত দূরে যায় এদের তীব্রতা তত কমে যায়। কারণ কী? না, রশ্মিগুলি যতই দূরে যায় ততই এ-দিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দিকে ছড়ানো রশ্মির তীব্রতা কম। এই বিশেষ প্রকৃতির আলোক রেখাগুলির তীব্রতা সব সময় সমানই থাকতো। তার মানে ছড়িয়ে পড়তো না, একই গতিপথে চলতো।'

ওরা চুপ করে শুনছিল। 'আচ্ছা, এবার বল—আলোক কীভাবে চলে?' প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন দাদু।

'তরঙ্গাকারে।' উত্তর দিল হীরু।

'বাঃ বাঃ। বেশ।' দাদু খুশি হয়ে বললেন, 'ভস্মলোচনের চোখ থেকে নির্গত আলোক তাহলে তরঙ্গাকারে চলতো, ঠিক তো?'

বীরু-হীরু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'তাহলে, এই রশ্মির আলোক-রেখাগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ ছিল সবই একই মাপের—এ-কথা মানতে হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণের আলোক-রেখা এতে ছিল না। সাধারণ আলোক-রশ্মির সংগে এইখানে এর তফাৎ। সাধারণ আলোক হলো, বেগুনী, গাঢ়নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল (সংক্ষেপে বেগানী সহকলা বা VIBGYOR)—এই সাতটি বর্ণের আলোক-রেখার সমষ্টি। একটি প্রিজমের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো বেরিয়ে এলে এই সাতটি বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়। একে বলে Dispersion of light। এদের তরঙ্গদৈর্ঘ-ও বিভিন্ন। বেগুনী থেকে লাল আলো পর্যন্ত আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ হলো 0·00004 সেমি থেকে 0·00008 সেমি অর্থাৎ এক সেমি-র এক লক্ষ ভাগের চার ভাগ থেকে আট ভাগ পর্যন্ত।'

দাদু ক্ষুদে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে ফের বলতে শুরু করলেন: 'তখনকার দিনে যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক। এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে, আঘাত থেকে রক্ষার জন্যে সৈন্যরা বর্মাবৃত থাকতো। আর বর্ম তৈরী হতো নিশ্চয়ই কোন ধাতব পদার্থ দিয়ে। ভস্মলোচনের চোখ থেকে নির্গত আলো ধাতব পাতকে ভেদ করতে পারতো—একথা বলা চলে নিঃসন্দেহে। কিন্তু সাধারণ আলোক-রশ্মি ধাতব-পাতকে ভেদ করতে পারে না।'

'রশ্মির এত তীব্রতা কেন?' বীরুর অবাক প্রশ্ন।

'যে রশ্মির আলোক-রেখাগুলি যখন একে অপরটির সাথে সমতা রেখে সমান্তরালভাবে চলে, তখন তারা পরস্পরকে ক্ষমতাশালী করে তোলে—এটাই নিয়ম। এই বিশেষ রশ্মির আলোক-রেখাগুলি নিশ্চয়ই অনুরূপভাবে চলতো, তাই এত তীব্র।'

বীরু-হীরুর দিকে দৃষ্টি হেনে দাদু জিগ্যেস করলেন, 'বল্ দেখি, এই বিশেষ প্রকৃতির আলোক-রশ্মি কী হতে পারে?'

প্রশ্ন শুনে, বীরু-হীরু তো গলদ্‌ঘর্ম। দাদু তখন বলতে আরম্ভ করলেন: 'তা তোদের না জানারই কথা। আজকাল এ-রকম রশ্মির নাম দেওয়া হয়েছে—'লেসার' (Laser) অর্থাৎ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation বা বিকিরণের উদ্দীপিত নিঃসরণের দ্বারা আলোর তীব্রতা বর্ধন। ভস্মলোচনের চোখ দিয়ে 'লেসার' বা লেসারের অনুরূপ কোন রশ্মি বের হতো। এ-থেকে প্রমাণিত হয়—'ভস্মলোচন' কোন সচেতন জীবের নাম না। আসলে ওটা লেসার যন্ত্র (আলো-বিবর্ধন যন্ত্র)। দর্পণে লেসারের প্রতিফলিত রশ্মিই শেষে যন্ত্রটাকে নষ্ট করে দেয়।'

'লেসারের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা কী?' হীরুর সপ্রতিভ প্রশ্ন।

দাদু বললেন, 'প্রযুক্তিবিদ্যায়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, শিল্পে-বাণিজ্যে লেসারের এখন খুব প্রচলন। সৈন্যবাহিনীতে লেসার এখন একটা শক্তিশালী অস্ত্র। এর সাহায্যে ক্ষেপণাস্ত্রের গতি নিয়ন্ত্রণ আর আকাশপথেই ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করা যায়। আকাশে কোন বস্তুর উপস্থিতি ও দূরত্ব নির্ণয়ের কাজে লেসার অপরিহার্য। তাছাড়া বস্তুর ত্রৈমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরীর কাজে এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়। শল্য চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের কাজে ছুরি হিসেবে এটাকে ব্যবহার করেন। চোখের কোন স্নায়ু ছিঁড়ে গেলে, লেসার ব্যবহার করে নিমেষে জোড়া লাগান হয়। দুর্বল আলোক-রশ্মিকে লেসার-যন্ত্রের সাহায্যে তীব্র শক্তিশালী রশ্মিতে পরিণত করা যায় অতি সহজে। তাই কারিগরী শিল্পে ধাতব-পদার্থ ছিদ্র করতে এটাকে কাজে লাগানো হয়েছে। রেডিও ও টেলিভিশনের সংকেত বহন করবার জন্যে ভবিষ্যতে আর বহু বেতার-তরঙ্গের দরকার হবে না। লেসার থেকে নিঃসৃত আলোক-তরঙ্গ একাই বয়ে নিয়ে যেতে পারবে। যাক্। দিদার কাছে আর কী গল্প শুনলি?'

হীরু বলল, 'ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করতে পারতেন মেঘের আড়াল থেকে। রাম-রাবণে যুদ্ধের সময় তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ নিক্ষেপ করেন। এতে কাবু হয় বহু বানরসেনা। তাঁর নিক্ষিপ্ত নাগপাশ-বাণ থেকে বেরিয়ে আসে চুরাশি লক্ষ সাপ। সাপগুলো বায়ুবেগে এসে রাম-লক্ষ্মণের হাত-পা বেঁধে ফেলে। অমনি দু'জনাই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান। উড়ো জাহাজ বা হেলিকপ্টারের মতো কোন আকাশযান চড়ে না হয় মেঘের আড়াল থেকে

যুদ্ধ করা সম্ভব। তাই বলে বাণ থেকে গুচ্ছের সাপ কী করে বেরিয়ে আসে? ব্যাপারটা কী আজগবি নয়?'

দাদু একটু ভেবে নিলেন। বললেন, গপ্পের মধ্যে কতখানি সত্যি আছে, খতিয়ে দেখতে হবে। তখনকার যুগে রেওয়াজ ছিল রূপক লেখা। আদিকবি বাল্মীকির লেখা রূপকের আড়ালে কী বৈজ্ঞানিক সত্য লুকিয়ে আছে, খুঁটিয়ে বিচার করা যাক।

'ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতেন—এর মানে হলো, পৃথিবীর মাটি থেকে কোন উঁচু জায়গায় তাঁর গোপান ঘাঁটি ছিল। সেখান থেকে শত্রু সৈন্যের ওপর কড়া নজর রাখা হতো। প্রয়োজনে অস্ত্র নিক্ষেপ করার-ও সুব্যবস্থা ছিল। এটা যেন আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহের মতো। রাম-লক্ষ্মণকে বিষধর সাপ দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। এর মানে, কোন শক্তিশালী অস্ত্রের সাহায্যে তাঁদের অস্ত্র প্রয়োগকে বন্ধ্যা করে দেওয়া হল। বর্তমানে যেমন কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে বিধ্বংসী লেসার-রশ্মির সাহায্যে প্রতিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রকে অকেজো করে দেবার বিশেষ ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে, তেমনি। আজকাল এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'নক্ষত্র-যুদ্ধ' বা 'স্টার ওয়ার্স'।'

'নক্ষত্র-যুদ্ধ'! বিস্ময়ে জিগ্যেস করল বীরু: 'সেটা আবার কী?'

'শোন্ তাহলে।' দাদু বলতে শুরু করলেন: 'নক্ষত্র-যুদ্ধ' মানে নক্ষত্র থেকে যুদ্ধ না। স্থল ও আকাশ থেকেই যুদ্ধ। এর আসল উদ্দেশ্য হলো, পারমাণবিক যুদ্ধ বন্ধ করা। Strategic Defence Initiative, সংক্ষেপে 'Star War' এই প্রকল্পটির নাম'।

দাদু বলতে লাগলেন: '২৩শে মার্চ ১৯৮৩ সাল। 'নক্ষত্র-যুদ্ধ' প্রকল্পের কথা প্রথম শুনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগনের ভাষণে। 'নক্ষত্র-যুদ্ধে'র ধারণা এসেছে জর্জ লুকাসের বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'স্টার ওয়ারস্' থেকে। এই যুদ্ধের ব্যাপারখানা বুঝতে হলে, প্রথমে জানা দরকার কীভাবে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়।'

ওরা উন্মুখ হলো। দাদু বললেন, 'ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ব্যাপারে জড়িত আছে নানাপ্রকার জটিল ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। নিক্ষেপের ঘটনাকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

'প্রথম পর্যায়ে ক্ষেপণাস্ত্র মাটি ছেড়ে ওপরে ওঠে। এতে সময় লাগে পাঁচ মিনিট। দ্বিতীয় পর্যায়ে আকাশে ওড়ে। সময় লাগে পাঁচ মিনিট। তৃতীয় পর্যায়ে ক্ষেপণাস্ত্র ছেড়ে দেয়. Decoy-সহ পারমাণবিক অস্ত্র। চতুর্থ পর্যায়ে—পৃথিবী থেকে সাতশো মাইল ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানে। সময় নেয় বাইশ মিনিট। মাথায় ঢুকছে?'

ওরা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ল। 'একটু একটু।'

'বেশ।' দাদু ফের বলতে শুরু করলেন, 'যে কোন একটি পর্যায়ে আঘাত হেনে পারমাণবিক অস্ত্র-প্রয়োগকে অকেজো করতে পারলে গোটা পারমাণবিক যুদ্ধ-ব্যবস্থাটাই অচল হয়ে পড়বে। প্রথম পর্যায়ে ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করাই হলো প্রকৃষ্ট পন্থা। এতে সফল না হলে পরবর্তী যে কোন পর্যায়ে আঘাত হেনে এই বিধ্বংসী অস্ত্রকে বিফল করা সম্ভব।

'এই প্রকল্পের প্রথম কাজ হচ্ছে. মহাকাশে ভূ-সমলয় উপগ্রহগুলি মারফৎ প্রতিপক্ষের কোন্ ঘাঁটি থেকে নিউক্লীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, তার খবর যোগাড় করা। এরপর পার্থিব কোন ঘাঁটি থেকে লেসার-রশ্মি প্রেরণ করা হয় কৃত্রিম উপগ্রহের দিকে। তখন উপগ্রহের কাজ হবে দর্পণের সাহায্যে শক্তিশালী লেসার-রশ্মিকে প্রতিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রের উপর প্রতিফলিত করা। এতেই ক্ষেপণাস্ত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। লেসার-রশ্মির গতিবেগ হলো আলোর গতিবেগের সমান (তিন লক্ষ কি.মি / সেঃ)। লেসারের গতিবেগ ক্ষেপণাস্ত্রের গতিবেগের চেয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশী। সেজন্য কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ক্ষেপণাস্ত্রের উপর আঘাত হানতে খুবই অল্প সময় লাগে। পরিষ্কার হচ্ছে?'

দাদু অল্প থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, 'পাঁচ থেকে দশ মেগা-ওয়াট শক্তি-সম্পন্ন লেসার তৈরীর চেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টা সফল হলে প্রতিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রকে নিমেষে ঘায়েল করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস থেকে চারশো কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন লেসার তৈরী করে তার উপযোগিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। সবচেয়ে শক্তিশালী লেসার-রশ্মি হলো 'এক্স রশ্মি-লেসার'। এটা নিখুঁতভাবে ক্ষেপণাস্ত্রকে আঘাত হানতে পারে কিনা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তবে কৃত্রিম উপগ্রহের দিকে লেসার-রশ্মি পাঠানো-ও এক সমস্যা। তার গতিমুখ ঘুরে যেতে পারে বায়ুমণ্ডলের বাধার ফলে। তাই এক বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে যাতে

গতিপথ ঘুরে না যায়। এই পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি একটা নলের ভিতর দিয়ে লেসার-রশ্মিকে পাঠানো হয় লক্ষ্য অভিমুখে।

দাদু একটু থামলেন। লম্বা শ্বাস ছেড়ে বিমর্ষমুখে বললেন, 'নক্ষত্র-যুদ্ধ' প্রকল্প যদি সফল হয়, তাহলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। তেজস্ক্রিয়তার কবল থেকে দুনিয়ার কেউই রক্ষে পাবে না রে।'

'দাদু এ যুদ্ধ থামানো যায় না?'

'কে থামাবে? আমরা যত সভ্য হচ্ছি, বিজ্ঞানকে নানান কাজে ব্যবহার করছি। বিজ্ঞান যেমন শান্তি আনতে পারে তেমনি শাস্তিও। আমরা এখন বিজ্ঞান-সভ্যতার যুগে বাস করছি। সভ্যতা এগোচ্ছে বিজ্ঞানও এগোচ্ছে। এই অগ্রগতি কেউ রুখতে পারবে না রে।'

দাদু চুপ করলেন।

বিজ্ঞানী ধরা পড়ল

সেদিন চমকে উঠলো চন্‌মনে গোটা পশ্চিমী দুনিয়া। পটভূমিঃ ভ্যানডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহ। তিল ধারণের জায়গা নেই। জড়ো হয়েছেন বিশ্বের খ্যাতকীর্তি বিজ্ঞানী, সেরা অধ্যাপক আর প্রতিভাবান গবেষক। সে এক এলাহি সমাবেশ। মিতু সেখানে লেসার-রশ্মি সম্বন্ধে জমকালো ভাষণ দিয়ে তাজ্জব খেল্‌ দেখিয়ে ছাড়ল। ভারতের অখ্যাত পল্লীর নাম-না-জানা এক বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় অভিনবত্বের গন্ধ পেয়ে শ্রোতৃবৃন্দ মিতুকে জানালেন উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন।

বিজয়ীর আনন্দে মিতুকে নিয়ে ফিরলাম নিজেদের আস্তানায়। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। চা-পর্ব সবে শেষ করেছি, আবির্ভাব ঘটল এক অপরিচিত ভদ্রলোকের। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, ষাটের মোহনায়। মাথায় ছ'ফুটের ওপর তো বটেই। পালোয়ানি চেহারা। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। পোশাকে ফিটফাট। স্যুট-বুট পরা। টপ্‌ হ্যাটে কান ঢাকা। নাম বললেন, ধরা যাক্‌ 'মিঃ ক্যাড্‌ক।' ছদ্মনাম। আসল নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। পদার্থ-বিজ্ঞানী। তবে তিনি জীব-রসায়ন নিয়েও গবেষণা করেন। পরিচয়-পর্ব শেষে তিনি বিবৃত করলেন এক করুণ কাহিনী।

'জীব-রাসায়নিক যৌগ নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছি অনেক দিন ধরেই।' তিনি বলছিলেন, 'সম্প্রতি সন্ধান পেয়েছি দুটি যৌগের। ক্যানসার সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনে এবং এটা সারাতে সাহায্য করবে।' এ-পর্যন্ত বলে মিঃ ক্যাড্‌ক থেমে গেলেন। টুপিটা খুলে টেবিলের এক পাশে রাখলেন। মুখ-চোখের অবস্থা দেখে মনে হলো যেন দুঃখে ম্রিয়মান। চোখ দুটো হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রগড়ে রীতিমত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ফের বলতে শুরু করলেন :

'এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি-স্বরূপ নোবেল পুরস্কার পেতে পারতাম। কিন্তু গবেষণার দরকারী কাগজপত্তর চুরি হওয়ায় এখন সে গুড়ে বালি। আমার দুর্ভাগ্য বলতে পারেন।'

থামলেন। সামান্য ইতস্তত ভাব। বললেন, 'সাহায্যের জন্য আপনাকে কী অনুরোধ জানাতে পারি?'

মিতু বলল, 'নিশ্চয়ই। এত বড় সুযোগ! হাত ছাড়া হয়ে যাবে? তা কী হয়? তবে একটা কথা। প্রথমে জানতে হবে আপনার গবেষণার বিষয়বস্তু কি। দেখতে হবে সেটির গুরুত্ব কতখানি। তারপর সাহায্যের কথায় আসা যেতে পারে।'

শুনে, মিঃ ক্যাড্‌ক খানিক গুম হয়ে থাকলেন। পরে বললেন 'এ-যে গোপনীয়'।

মিতু হেসে বলল, 'ওটা যখন পাচার হয়ে গেছে, তখন কী আর গোপনীয় থাকছে?'

মিঃ ক্যাড্‌ক একটু দমে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন 'না, না। সে কথা বলছি না। আপনি যখন…। মানে, আপনি হলেন আমার শুভাকাঙ্খী। আপনাকে বলতে আপত্তিই-বা কী থাকতে পারে? শুনুন তবে—

আমার আবিষ্কার হলো দুটি—নার্ভ গ্রোথ ফ্যাক্টর আর এপিডারম্যাল গ্রোথ ফ্যাকটর।'

মিতু ভ্রূ-জোড়া কপালে তুলে বলল, 'ওঃ। তাই নাকি! ব্যাপারটা কৌতূহলজনক বটে। তবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না যে। দয়া করে যদি খুলে বলেন।'

মিঃ ক্যাড্‌ক বললেন, 'এটা বোঝাতে হ'লে মলিকিউলার বায়লজি (Molecular Biology) সম্বন্ধে আগে কিছু বলতে হয় যে।'

'বেশ ত। বলুন।'—মিতু উৎসাহ দেখায়।

মিঃ ক্যাড্‌ক আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন, 'স্ত্রী আর পুংজনন কোষের মিলনে সৃষ্টি হয় ভ্রূণ। একটিমাত্র কোষ বিভাজিত হতে আরম্ভ করে মিলনের অব্যবহিত পরে। সৃষ্ট হয় হরেকরকম কোষকলা। কিছু কোষ তৈরী করে স্নায়ুমণ্ডলী, কেউ-বা পেশী, কেউ-বা অস্থি। এখন প্রশ্ন? —কোন কোষটি কী কাজ করবে তার নির্দেশ তাকে কে দেয়? আরো আশ্চর্য ব্যাপার—ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে একটি প্রাণীর অবয়ব। সেই অবয়ব বাড়তে বাড়তে শেষে রূপ নেয় একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর। এই বেড়ে-যাওয়া অঙ্গ-প্রতঙ্গের মধ্যে থাকে সামঞ্জস্য আর সীমা। অর্থাৎ আয়তন বা আকৃতির মধ্যে থাকে স্থায়িত্ব, ছন্দ প্রভৃতি। একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিলেই একেবারে থেমে যায় বৃদ্ধির গতি। এখন প্রশ্ন, কতদূর কাজ করবার পর থামতে হবে—এই নির্দেশ কোষগুলিকে কে দেয়?'

মিঃ ক্যাড্‌ক খানিক থেমে ফের বলতে শুরু করলেন: 'এই রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে গ্রোথ ফ্যাকটরের মধ্যে। এর উৎপাদন ঘটে কোষকলার মধ্যেই। বিভাজন ঘটিয়ে কোন কোষকলা কখন্‌ ও কতটা বৃদ্ধি করতে হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে গ্রোথ ফ্যাকটরগুলি। যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকতো তাহলে সুস্থ কোষ বর্ধনশীল টিউমার বা ক্যানসার কোষে রূপান্তরিত হতো। সোদ্দা কথা হলো. ক্যানসার সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে গ্রোথ ফ্যাকটরের ভূমিকা।'

মিঃ ক্যাড্‌ক বলছিলেন, 'অনকোজিন নামে এক বিশেষ ধরনের জিন আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এটি গ্রোথ ফ্যাকটর হিসেবে কাজ করে। কোনো কারণে এই জিনের মধ্যে গঠনগত পরিবর্তন এলে এটি সৃষ্টি করে ক্যানসার। খাদ্যের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় মৌল শরীরে ঢুকলে, মৌলগুলি বিকিরণ করে তেজস্ক্রিয় রশ্মি। বিকিরণে সুপ্ত 'অনকোজিন' জেগে ওঠে। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় এটি সৃষ্টি করে ক্যানসার।'

মিতু বলল, 'বুঝলুম। তারপর?'

মিঃ ক্যাড্‌ক বললেন,—'আমার গবেষণা এই গ্রোথ ফ্যাকটর নিয়ে। আমার আবিষ্কৃত গ্রোথ ফ্যাকটর হলো—নার্ভ গ্রোথ ফ্যাকটর আর এপিডার-ম্যাল গ্রোথ ফ্যাকটর। বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপের সংগে নার্ভ গ্রোথ ফ্যাকটরের একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছি। ত্বক ও চোখের বহিরাংশের কোষকলার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে এপিডারম্যাল গ্রোথ ফ্যাকটর। এটি ত্বক ও কর্নিয়ার ক্ষত সারাতে ওস্তাদ। আবার এটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এক বিশেষ ধরনের ক্যানসারের ক্ষেত্রে। আমার আবিষ্কার চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে আমি আশা রাখি। তাই বলছিলাম. নোবেল পুরস্কারটা একেবারে বেহাত হয়ে গেল।'—মিঃ ক্যাড্‌ক কপালে হাত দিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। মনে হলো তিনি দুঃখ ও হতাশায় ভেঙে পড়েছেন।

'আচ্ছা, কাকে আপনার সন্দেহ হয়?'

মিঃ ক্যাড্‌ক বললেন, 'অধ্যাপক কোহেন'।

শুনে, মিতুর চক্ষুস্থির। সে বলল, 'অধ্যাপক কোহেন! সে কি: প্রমাণ আছে কিছু?'

মিঃ ক্যাড্‌ক উত্তেজিতভাবে বললেন, 'ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে আমার ঝুলিতে। ওনার সংগে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বেশ ভাল রকমই। প্রায়ই আমার কাছে আসতেন। গ্রোথ ফ্যাকটর নিয়ে আলোচনা যে হতো

না, তা নয়। একদিন তাঁর দেওয়া একটি সিগারেটে কয়েকটা সুখ টান দিলাম। সহসা বেহুঁস হয়ে পড়ি। জ্ঞান ফিরলে দেখি, অধ্যাপক কোহেন চলে গেছেন। আর, সেই সংগে গবেষণার কাগজপত্তর উধাও। সন্দেহ হলো। তৎক্ষণাৎ লোক পাঠালাম অধ্যাপক কোহেনের খোঁজে। তাকে পাওয়া গেল না। তাঁর ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ। সন্দেহ গাঢ় হলো। উঠে গেলাম ঘরের কোণে রাখা সচিত্র দূরভাষের (Picture phone) কাছে। বোতাম টিপে দিলাম। দূরদর্শনের পর্দায় ভেসে উঠল অধ্যাপক কোহেনের ছবি। তাঁকে চুরির ব্যাপারটা বললাম। তিনি কিন্তু বেমালুম চেপে গেলেন। বিস্ময় প্রকাশ করলেন। পর্দায় দেখতে পেলাম আর এক ভদ্রলোককে। তিনি মুদ্রলেখক। কি সব টাইপ করছেন, খট্‌খট্‌ খট্‌খট্‌। শব্দ কানে এলো। ঘরের বাইরে তালা। অথচ তিনি ভেতরে গোপনে টাইপ করাচ্ছেন। ব্যাপার তাহলে আন্দাজ করুন।' তিনি থামলেন।

'সচিত্র দূরভাষ কী?'—বীরু হঠাৎ জিগ্যেস করল।

দাদু বললেন, 'যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছে আমেরিকার বেল টেলিফোন এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানি। খুব দামী। আমাদের দেশে সাধারণের নাগালের বাইরে। এটির তিনটি অংশ—পিকচার টিউব ইউনিট, কন্‌ট্রোল ইউনিট আর পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট। ক্যামেরা আর পর্দা নিয়ে পিকচার টিউব ইউনিট গঠিত। কন্‌ট্রোল ইউনিটে থাকে টেলিফোন যন্ত্র। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটটি রাখা হয় টেবিলের নিচে। আলোর দীপ্তি যাই হোক না কেন, এটির সাহায্যে ছবি পেতে কোন অসুবিধে হয় না। এই যন্ত্রে আছে তিন জোড়া তার। এক জোড়া শব্দ বাকী দু' জোড়া ছবি পরিবহনের কাজ করে। সচিত্র দূরভাষে কোন নির্দিষ্ট নম্বরে ডায়েল করতে হয় না। ডায়েল করতে হয় বোতাম টিপে। বোতাম টেপার সংগে সংগে পিকচার ইউনিট চালু হয়ে যায়। কন্‌ট্রোল ইউনিটের বোতাম টেপামাত্র দূরভাষের অপর প্রান্তে যার সাথে কথা বলতে চাই তার সাথে যোগাযোগ হয়। এবার শোন্‌ মিঃ ক্যাড্‌কের কাহিনী।'

মিতু মিঃ ক্যাড্‌কের কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তিনি থামতেই, মিতু বলল, 'নিশ্চয় করে তবুও কিছু বলা যায় না। আর কি প্রমাণ আছে?'

'আমি তারপর মাছি-গোয়েন্দাকে পাঠালাম।'

মিতুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ব্যঙ্গে বলল সে, 'হাতি ঘোড়া গেল তল / ভেড়া বলে কত জল।'

মিঃ ক্যাড্‌ক তখন বিনীতভাবে বললেন, 'হ্যাঁ। আজগবি বলে মনে হবে। আগে ব্যাপারটা ভেঙে বলতে দিন। পরে বুঝতে পারবেন ঠিক বলছি, না বেঠিক বলছি।'

মিতু তখন শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা। বলুন তবে।'

মিঃ ক্যাড্‌ক সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'এটি হলো আড়িপাতার যন্ত্র। খুবই সূক্ষ্ম। আমারই আবিষ্কার। দুনিয়ার কাছে অজ্ঞাত আজো। যন্ত্রটি কিভাবে কাজ করে, বলি :

'আলপিনের মতো ছোট্ট একটা শক্তিশালী ট্রান্সমিটার বসানো থাকে মাছির দেহে। আর দেহের সাথে বিশেষ আঠার সাহায্যে জুড়ে দেওয়া হয় একটা ছোট্ট রেডিও। রেডিও-টার আয়তন ঠিক দেশলাই-কাঠির মাথায় বারুদের সমান। কাজে লাগানোর আগে মাছিকে বিষাক্ত গ্যাস স্প্রে করা হয়। এতেই মাছির মৃত্যু হয়।

'এরূপ একটা আড়িপাতা যন্ত্র জানলা দিয়ে অধ্যাপক কোহেনের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। খুব সন্তর্পণে। ব্যস। তাঁর গলার আওয়াজ পেলাম। তিনি তখন কী পড়ছেন। একরকম চিৎকার করে। আমার গবেষণার বিষয়বস্তুর অংশবিশেষ — বুঝতে মোটেই অসুবিধে হলো না। আরো শুনতে পেলাম মুদ্রলিখের শব্দ—খট্‌খট্ খট্ খট্, খট্ খটা খট্ খট্…।'

'কী ধরনের সাহায্য আপনি নিতে চান?' জিগ্যেস করল মিতু।

মিঃ ক্যাড্‌ক বললেন, 'নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক টাকা আপনাকে দেবো। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। ওনার গবেষণাগার পুড়িয়ে দিতে চাই লেসার-রশ্মি ছুঁড়ে। শুধু প্রয়োগ-কৌশল আমাকে শিখিয়ে দিন। ব্যস। এই একটাই আমার অনুরোধ।'

শুনে, আমার মেজাজ গেল বিগড়ে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলাম। মিতু কিন্তু ধীর গলায় বলল, 'এতে আপনার কাগজ-পত্তর নষ্ট হবে, সত্যি কথা। কিন্তু অধ্যাপক কোহেনের তো ক্ষতি হতে পারে।'

'হোলে, হবে। যেমন কর্ম তেমনি ফল। আর এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।'—মিঃ ক্যাড্‌ক উত্তেজিত।

'এত বড় বিপদের ঝুঁকি নেওয়া কী ঠিক হবে? আপনারা দুজনাই তো যুগ্মভাবে পুরস্কার পেতে পারেন।'

'ফালতু একজন আমার প্রাপ্য অর্থের উপর ভাগ বসাবে তা হতে পারে না।' ক্ষোভের সংগে বললেন মিঃ ক্যাড্‌ক।

'কেন? এই মাত্তর আমাকে অর্ধেক দেবেন বলে তো আপনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমিও তো ফালতু।'

'না। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। টাকাটাই বড় কথা নয়। উনি সম্মানের-ও তো দাবীদার হবেন। পুরো সম্মানটা আমি পাচ্ছি কোথা?'

মিতু হেসে বলল, 'তা ঠিক। পুরস্কার হাতছাড়া হয়ে যাবে। ভারি অন্যায়। ঠিক আছে। লেসার-প্রয়োগের কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছি। এখুনি।'

অতঃপর মিতু বাক্স থেকে একটা টুপি বের করল। মিঃ ক্যাড্‌কের মাথায় পরিয়ে দিল সেটা। টুপি থেকে এক গোছা বৈদ্যুতিক তার গেছে কম্পিউটারের ভেতর। মিতু কম্পিউটার চালু করে দিল। এক ঝাঁক যন্ত্রপাতি টেবিলের ওপর রেখে সে নাড়াচাড়া করতে লাগল। প্রায় ঘন্টা-খানেক বাদে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মিঃ ক্যাড্‌কের দিকে। বলল, 'আজ এই পর্যন্ত। আগামীকাল সন্ধ্যের পর আসুন।'

পরদিন মিঃ ক্যাড্‌ক এলেন বেশ উৎফুল্ল মেজাজে।

মিতু বলল, 'মিঃ ক্যাড্‌ক, আমি দুঃখিত। এ-ব্যাপারে কোনরকম সাহায্য দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।'

মিঃ ক্যাড্‌ক যেন আকাশ থেকে পড়লেন। মহাবিস্ময়ে তিনি করলেন, 'সে কী! হঠাৎ মত পরিবর্তন।'

'আপনি নিজেই অধ্যাপক কোহেনের গবেষণার বিষয়বস্তু চুরি করেছেন —তা বলছি না। তবে নকল করেছেন নিশ্চয়ই। এ-ব্যাপারে আপনার আড়িপাতা যন্ত্র হলো হাতিয়ার। তাছাড়া, অধ্যাপক কোহেনকে খুন করে পুরস্কারটি আপনি আত্মসাৎ করতে চান।'

মিঃ ক্যাড্‌ক তো রেগে টং। হুংকার ছাড়লেন, 'প্রমাণ?'

মিতু হাসল। বলল, 'প্রমাণ! যথেষ্ট প্রমাণ আছে। জারিজুরির সাক্ষী ঐ কম্পিউটার। তবে শুনুন।' মিতু বোতাম দিল টিপে। টেপ বেজে উঠল।

শুনে, মিঃ ক্যাড্‌ক তো একেবারে থ'। তাঁর ক্রোধের আগুন নিবে গেল নিমেষে। তিনি কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, 'অন্যায় হয়েছে, মাপ করবেন। আপনাকে আর একটা অনুরোধ।'

'বলুন।'

'কীভাবে আমার চিন্তাধারা টেপে ধরা পড়ল?'

'বলছি।' মিতু বলতে লাগল,

'মানুষের অবচেতন মনে ক্রীয়াশীল চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়া হয় মস্তিষ্কে। সেগুলির চুম্বকীয় ছাপ (Magnetic imprint) পড়ে স্নায়ুকোষে। এরই নাম স্মৃতি। এই স্মৃতিকে যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ধার করা যায়। আপনাকে গতকাল যে টুপিটা পরানো হয়েছিল, সেটি হলো একটা যন্ত্র। সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তার দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী। এই টুপীর মাধ্যমে আপনার স্মৃতির হুবহু তড়িৎ চুম্বকীয় স্পন্দনের (Electro-magnetic impulse) ছাপ জমা পড়েছে কম্পিউটরের টেপে (ফিতায়)। কম্পিউটরের ভেতর আছে তড়িৎ-চুম্বকীয় ছাপকে শব্দে রূপান্তরিত করবার যন্ত্রপাতি আর আছে ধ্বনি-বিবর্ধন যন্ত্র (Loud-hailer)। এই বিবর্ধন-যন্ত্রটি তো শোনাল আপনার মনের কথা।'

মিঃ ক্যাডকের বুকখানা যেন শুকিয়ে গেল। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মুষড়ে-যাওয়া দেহটাকে টেনে নিয়ে বাকশূন্য অবস্থায় টলতে টলতে তিনি বিদায় নিলেন।

সেই সাধু ও পরমাণু বোমা

স্মৃতির আয়নাখানা সাফ করতে গিয়ে আবছা আবছা ফুটে উঠল একজনার মুখচ্ছবি। বেশ মন মাতানো। তিনি সাধুর বেশধারী। তবে খাঁটি সাধু কি না জানি না। চেহারায় বিদেশীর ছাপ স্পষ্ট। বয়স পড়তির দিকে। হঠাৎ তাঁর দর্শন পাই বেনারসের হরিশ্চন্দ্র শ্মশান ঘাটে। সংগে আমার সমবয়সী বন্ধু মিতু।

গুটিকয় স্থানীয় ভদ্রলোক সাধুবাবাকে ঘিরে গুটিসুটি মেরে বসে আছেন। হয়ত তাঁরা বাবার অনুরাগী ভক্ত, হয়ত-বা বিদেশী সাধু বলে কৌতূহলী কিংবা সাধুর এলোমেলো আচরণে মজার স্বাদ পেয়ে ভিড় জমিয়েছেন।

কে এই রহস্যময় সাধু? কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন, কখনো-বা তলিয়ে যান চিন্তার অতলে। অদ্ভুত ধরনের সব কথাবার্তা। নিখুঁত ইংরাজি উচ্চারণে সাহেবী টান। তবে কী সাধুর মাথায় গণ্ডগোল। হাবভাব ও রকমসকম দেখে তাই মনে হলো। মিতু তাঁকে অনেকক্ষণ দেখল। সে কিন্তু সাধুর বহুবার আওড়ানো অসংলগ্ন কথার অন্য মানে করলো। সে কথা পরে। তাঁকে পাগল ঠাহরানোর কারণ প্রথমে খুলে বলি:

—হাঃ হাঃ হাঃ। সাদা দাঁতগুলো বের করে সাধুবাবার সে কি হাসি: এই বয়সে দাঁতগুলো আসল না নকল—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে। হাসির চোটে গোটা হৃদপিণ্ডটা ঠাণ্ডা মেরে যাবার উপক্রম।

হাসির বেগটা ক্রমশঃ কমে শেষে থিতিয়ে গেল। সমুদ্রের বুকে এক গাদা পাগলা ঢেউ যেন সশব্দে মাথা চাড়া দিয়ে আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ল। কিন্তু মাথাটা আমার গুলিয়ে গেল যখন তাঁকে বলতে শুনলাম, 'আমি জালিয়াত, আমি চোর, আমি ডাকাত আমি খুনী···। গ্রেপ্তার···। শাস্তি চাই। জেলখানায় ঠাঁই মিলল না। কেন? কেন? কেন?' আবার সেই এক ঝলক তীব্র হাসি।

হাসির বেগ কমে যায়। তিনি বিড় বিড় করে বলতে থাকেন: 'তোরা ভেবেছিস কী? মরে বেঁচে থাকবো?' লালচে চোখজোড়া জলে

টই-টম্বুর। কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অশ্রুসাগরে হাহাশ্বাস, হাহাকার। তারপর রুদ্ধগলায় অস্ফুট স্বরে: 'দাউ দাউ…। গাছপালা বাড়িঘর…। পলকে পুড়ে ছাই। নিরীহ মানুষ অগুণতি। আঃ আঃ উঃ উঃ।' যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলেন। তারপর গা-টা ঝাড়া দিয়ে ভারি গলায় বললেন, 'হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ। গায়ের চামড়া ঝলসে…। প্রবল ঝড়। বাড়িঘর ধূলিসাৎ নিমেষে। বিকলাঙ্গ নগ্ন মানুষের মিছিল। কারো চোখ নেই, কারো নাক নেই কারো-বা উড়ে গেছে মুখের সবটা।' তারপর আচমকা একটি শ্লোক শুনে, স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

গীতা, ১১।১২

পরক্ষণে আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বীভৎস আর্তনাদ করে উঠলেন, 'জল দাও, জল দাও'। হায় হায় 'লিটল বয়'। কী লজ্জা! কী লজ্জা! মাটিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মনে হলো, যন্ত্রণাময় বিচ্ছেদের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। কতকগুলো লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধুবাবার মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলো। কেউ কেউ হাত-পাখার বাতাস করতে লাগলো। আমরা সরে পড়লাম।

মনে তখন সাধু-সম্বন্ধে কৌতূহলের পাহাড় জমেছে। তাই পরদিন ফের গেলাম তাঁর দর্শনে। দেখতে পেলাম না। বেপাত্তা। একেবারে ছিটগ্রস্ত। হয়ত অন্য কোথায় আস্তানা গেড়ে থাকবে—এই ভেবে সারা বেনারস আঁতিপাতি খুঁজলাম। নাঃ, কোন হদিশ মিললো না। তখন মিতু বললো, 'মার্কিন পুলিশ যাঁর খোঁজে সারা দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলল, তাঁকে হাতের কাছে পেয়েও চিনতে পারলাম না। ফসকে গেল। কী আপসোস!'

মিতুর কথার মানে বুঝতে পারলাম না। তাই জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকালাম। তখন সে ভেঙে বললো:

'সাধুর অপরাধ গুরুতর। অবিশ্যি ওপরওয়ালার হুকুমে বা চাপে এরকম বাধা হয়েই তিনি কুকাজ করেছেন। পাপবোধে পীড়িত হয়ে মনে হয় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তাই এতো সব খাপছাড়া কথা। তবে এর মধ্যে গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে। যে সর্বনেশে ধ্বংসলীলার

বর্ণনা শুনলাম, তা ঘটতে পারে একমাত্র পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণে। সংস্কৃত শ্লোকটি বিস্ফোরণেরই ইঙ্গিতবহ। শ্লোকটির অর্থ হলো—যদি আকাশে এককালে হাজার খানেক সূর্যের উদয় হয়, তাহলে সেই জ্যোতিঃ এই বিশ্বরূপধারী শ্রীভগবানের তেজের সমান হতে পারে। এই যে হাজার হাজার সূর্যোদয়ের উপমা, তা পরমাণু-বোমা ফাটানোর কথাই মনে করে দেয়। তাছাড়া 'লিটল বয়' বা 'ছোট খোকা' হলো হিরোসিমার মারণ-যজ্ঞের কারণ। সাধুবাবার স্নায়ু-বৈকল্যের কারণ হচ্ছে তাঁর অপরাধবোধ। অর্থাৎ তাঁরই সংকেতে 'লিটল বয়'-কে হিরোসিমার মাথার উপর নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সাধুবাবাই হলেন মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন মেজর, ক্লদ ইথারলি—'বি-২৯' বিমানের চালক। এই বিমানের পেটে শুয়ে ছিল 'লিটল বয়'।

'লিটল বয়' কী?—হীরু জিগ্যেস করল।

দাদু বিমর্ষমুখে বললেন, '১৯৪৫ সালে ৬ই আগস্ট হিরোসিমার ৫৫০ মিটার ওপর থেকে বিক্ষিপ্ত পরমাণু-বোমার নাম। এটির ধ্বংসাত্মক শক্তি বিশ হাজার টন টি-এন-টি (T. N. T.) বোমার তেজের সমান।'

'টি-এন-টি কাকে বলে?' হীরুর প্রশ্ন।

'উচ্চ বিস্ফোরক শক্তিসম্পন্ন রাসায়নিক বোমা।'

'পরমাণু বোমা কী করে তৈরী হয়?' হীরু বোকাভাবে প্রশ্ন করল।

'কেন রে? তোরা একটা তৈরী করবি বুঝি?'—রসিকতা করে বললেন দাদু।

হীরু ঢোঁক গিলে বললো, 'না, তা নয়। জানতে ইচ্ছে করে।'

'বেশ। তবে শোন:

'ব্যাপারটা বুঝতে হলে, দাদু বললেন, 'পরমাণুর গঠন-কৌশল সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। কোনো মৌলের যে ক্ষুদ্রতম কণিকা মৌলের সব ধর্ম বহন করে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে তাকে ঐ মৌলের পরমাণু বলে। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন মেশন, নিউট্রিনো প্রভৃতি কণা দ্বারা মৌলের পরমাণু গঠিত। প্রকৃতিতে স্থায়ী মৌলিক পদার্থের সংখ্যা হল 92টি। এদের মধ্যে হাইড্রোজেন সবচেয়ে হাল্কা আর ইউরেনিয়াম হচ্ছে সবচেয়ে ভারি। তাছাড়া 13টি ক্ষণস্থায়ী মৌলিক পরমাণু কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা হয়েছে। এগুলি ইউরেনিয়ামের চেয়েও ভারি। থাক সে কথা। এখন পরমাণুর গঠন-কৌশল বলি।'

দাদু বলতে লাগলেন, 'পরমাণুর কেন্দ্রীনের গঠন হয় প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টি দ্বারা। পরমাণুর সবচেয়ে ভারি ও সুস্থিত অংশ হল কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস। ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সংখ্যায় বিভিন্ন কক্ষপথে ঘোরে। একটি গোটা পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যায় সমান। কেন্দ্রীনে প্রোটনগুলি একে অন্যের সংগে সর্বদা সংঘাতে আসতে চায়। সেখানে শান্তিরক্ষার ভার নিউট্রন-পুলিশের ওপর। সেজন্য প্রোটনের সংখ্যা যত বাড়ে, নিউট্রনের সংখ্যাও তত বাড়ে। ধরা যাক, হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের কথা। হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীনে আছে একটি মাত্র প্রোটন। তাই সেখানে সাম্য বজায় রাখতে নিউট্রন-পুলিশের প্রয়োজন হয় না। হিলিয়ামের কেন্দ্রীনে আছে দুটি প্রোটন। তাই সেখানে পাহারার কাজে রয়েছে দুটি নিউট্রন-পুলিশ। এজন্য এর ভর সংখ্যা হল, 4। ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা হলো 92 আর নিউট্রনের সংখ্যা হল 146টি। তবুও নিউট্রন একসংগে প্রোটনগুলিকে ধরে রাখতে পারছে না। অর্থাৎ ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীন মোটেই সুস্থিত না। ফলে সর্বদা ভাঙছে। ক্রমাগত α (আলফা—ক্ষুদ্র কণার স্রোত), β (বিটা —দ্রুতবেগ সম্পন্ন ইলেকট্রন), γ (গামা—একপ্রকার তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ) —এই তিন প্রকার অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করে এটি অবশেষে সীসাতে রূপান্তরিত হয়। এ-রকম মৌলকে বলে, স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ। আর রশ্মিগুলিকে বলা হয়, তেজস্ক্রিয় রশ্মি (Radio-active rays)। তবে ইউরেনিয়ামের সীসাতে রূপান্তরিত হতে দীর্ঘকাল সময় লাগে। এটির অর্ধজীবন (half-life period) হল, 450 কোটি বছর। অর্ধজীবন মানে, এই সময়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম তার অর্ধেক পরিমাণে এসে পৌঁছায়।—বুঝতে পারছিস তো ?'

ওরা ঘাড় নাড়ল। বোঝা গেল না বুঝতে পারছে কি না। চুপচাপ শুনতে লাগল।

দাদু বলছিলেন, 'কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর রাসায়নিক গুণাবলী (Chemical properties) নির্ভর করে তার প্রোটন সংখ্যার উপর। প্রোটন সংখ্যার কোন পরিবর্তন না হলে পরমাণুর রাসায়নিক গুণের কোন পরিবর্তন হয় না। নিউট্রন সংখ্যার পরিবর্তনে বদলায় শুধু পরমাণুর ভৌত ধর্ম (Physical properties), যেমন ভর বা ওজন, ঘনত্ব। রাসায়নিক ধর্ম থাকে অপরিবর্তিত। পর্যায়-সারণীতে পরমাণুর স্থান ঠিকই থাকে।'

'পর্যায়-সারণী কাকে বলে?'—হীরু ধাঁ করে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

দাদু সহাস্যে বললেন, 'প্রখ্যাত রাসায়নবিদ মেণ্ডেলিয়েফ এটা আবিষ্কার করেন 1869 সালে। পর্যায়-সারণীতে (Periodic table) সমস্ত মৌলিক পদার্থ, পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা অনুসারে ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে। এ-থেকে কোন পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা, পারমাণবিক ভর, রাসায়নিক গুণ ইত্যাদি এক নজরে জানা যায়। যেমন এই সারণীতে প্রথম ঘরে আছে সবচেয়ে হালকা পদার্থ হাইড্রোজেন। এটির পারমাণবিক সংখ্যা হল 1 আর ভর হল 1। দু-নম্বর ঘরে আছে, হিলিয়াম। এটির পারমাণবিক সংখ্যা হল 2, আর ভর সংখ্যা হল 4। সর্বশেষ 92 নম্বর ঘরে আছে সবচেয়ে ভারি পদার্থ—ইউরেনিয়াম। আচ্ছা বলত, আইসোটোপ কাকে বলে?'

বীরু-হীরু থতমত খেয়ে চুপ করে রইল।

দাদু একটু হেসে বললেন, 'সে-কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম। পর্যায়-সারণীতে পড়ে খেই হারিয়ে গেল। তবে শোন :

'গ্রীক ভাষায় Isos মানে সম আর Topos মানে স্থান। যে সব মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ক্রমাঙ্ক একই অথচ ভর সংখ্যা বা ওজন আলাদা, তাদেরও পর্যায়-সারণীতে স্থান দেওয়া হয়েছে একই ঘরে। এ-রকম একই পদার্থের রকমারি ওজনের পরমাণুদের বলে, একস্থানিক মৌল বা আইসোটোপ। এদের প্রত্যেকটির প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন। সংক্ষেপে একই সংখ্যক প্রোটনের সংগে বিভিন্ন সংখ্যার নিউট্রন জুড়ে দিলেই, আইসোটোপের সৃষ্টি হবে। যেহেতু রাসায়নিক গুণাবলী নির্ভর করে প্রোটন সংখ্যার উপর, তাই ওদের রাসায়নিক ধর্ম থাকে অপরিবর্তিত। ধরা যাক ইউরেনিয়ামের কথা। এটির আইসোটোপের সংখ্যা হলো, 6। এগুলো সবই 92 নম্বর ঘরে। প্রত্যেকটির প্রোটন সংখ্যা 92 কিন্তু নিউট্রন সংখ্যার উপর বিচার করে ভর সংখ্যা হলো 233, 234, 235, 237, 238 এবং 239। 235 ভর সংখ্যা বিশিষ্ট আইসোটোপ পরমাণু বোমা তৈরীর কাজে লাগে। 'লিটল বয়' তৈরী করতে লেগেছিল ষাট কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম—235 (U^{235})।

'এবার U^{235} দিয়ে কীভাবে পরমাণু বোমা বানানো হয়, বলি :

'সবচেয়ে হালকা হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন ছাড়া সব কেন্দ্রীনই গঠিত

হয় প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে। এই কণিকাগুলো এক প্রকার শক্তিতে জমাট বেঁধে থাকে। জাপানী বৈজ্ঞানিক য়ুকাওয়ার প্রমাণ করেন 'পাই-মেসন' কণার স্থির অবস্থার শক্তিই হল কেন্দ্রীনকে বেঁধে রাখার শক্তি। আয়তনে প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা দুটো একই প্রকার, ভরও প্রায় সমান। শুধু তফাৎ হলো, প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত আর নিউট্রন হলো আধান নিরপেক্ষ (Neutral)। পরমাণুর কেন্দ্রীনই হলো শক্তির আধার।

'কোন একটা পরমাণুকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করে তার সমান শক্তি পাওয়া এখনো সম্ভব হয়নি। তবে পরমাণুর কেন্দ্রীনের বিভাজন (Fission) ঘটিয়ে শক্তি পাওয়া যায়। এই শক্তির পরিমাণও নেহাৎ কম না। কীভাবে কেন্দ্রীনের বিভাজন করা হয়, শোন্ :

'কোন কণিকা দিয়ে পরমাণুর কেন্দ্রীনকে আঘাত করে ভেঙে দুটুকরো করা হয়। এই নোতুন সৃষ্ট কেন্দ্রীন দুটির মোট ভর আঘাতের আগে মূল কেন্দ্রীনের ভরের চেয়ে কিছু কম। অর্থাৎ বিভাজনের ফলে কিছু ভর কমে যায়। এই হ্রাসপ্রাপ্ত ভরই আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্রানুসারে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আইনস্টাইনের সূত্র হলো $E=mc^2$. (E=উৎপন্ন শক্তি, m=রূপান্তরিত ভর, c=আলোর গতি / সেঃ)'

দাদু বলে যাচ্ছেন আর ওরা শুনছে।

'সামান্য ভরের বিনিময়ে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভবকে পরমাণু বোমা তৈরীর কাজে লাগান হয়েছে। আধান-নিরপেক্ষ নিউট্রন কণিকাকে আঘাতকারী বুলেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কেন্দ্রীনের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে ঋণাত্মক বিদ্যুতাহিত ইলেকট্রন। নিউট্রন হল আধান-নিরপেক্ষ। তাই নিউট্রনের গতিপথে ইলেকট্রন কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। কেন্দ্রীনের প্রোটনগুলি হল ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত। আঘাতকারী কণিকা ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত হলে দুটি সমধর্মী আধানের মধ্যে বিকর্ষণের (R pulsion) সৃষ্টি হতো। তাই প্রোটনগুলি বিকর্ষণ ঘটাতে পারে না। ফলে নিউট্রন বিনা বাধায় কেন্দ্রীনকে আঘাত হানে।'

দাদু ওদের দিকে তাকালেন। বললেন, 'এবার কিন্তু মন দিয়ে শুনতে হবে।

'ধীর গতিসম্পন্ন নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীনটি ভেঙে দু'টুকরো হয়। টুকরো দুটি প্রায় সমান। টুকরো দুটির একটি হল বেরিয়াম

(Ba) আর অপরটি হল ক্রিপটন (Kr)। এই নিউক্লিয় বিভাজনের ফলে দু-তিনটি নিউট্রন এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি উদ্ভূত হয়। এই শক্তির পরিমাণ হবে প্রায় 200 Mev.। এই ধরণের বিভাজনকে বলে, নিউক্লিয়ার ফিশন (Nuclear Fission)। এই নিউক্লিয়ার ফিশনকে সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় :

$$_{92}U^{235} + _{0}n^{1} \rightarrow _{92}U^{236} \rightarrow _{56}Ba^{141} + _{35}Kr.^{92} + 3_{0}n^{1} + 200\ Mev.$$
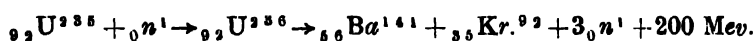
'এই বিক্রিয়ায় মুক্ত তিনটি নিউট্রন আরো U^{235} কেন্দ্রীনকে বিভজিত করে এবং নয়টি নিউট্রন নিঃসৃত হয়। এগুলি আবার আরো নয়টি U^{235} কেন্দ্রীনের বিভাজন ঘটায়। ফলে মোট সাতাশটি নিউট্রন মুক্ত হয়। প্রক্রিয়াটি এভাবে পরপর চলতে থাকে। ফলে, একবার নিউক্লীয় বিভাজন আরম্ভ হলে তা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর আধার ধারণ করে। পরমাণু বিভাজনের এই নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াকে বলে, শৃঙ্খল বিক্রিয়া (Chain Reaction) বা ধারাবাহিক বিক্রিয়া। শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় অল্প সময়ে প্রচুর পরমাণুর বিভাজন ঘটে এবং প্রতিবারই বিপুল পবিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তিকেই বলে, পারমাণবিক শক্তি। পরমাণু বোমা বানাতে ধারাবাহিকভাবে নিউক্লিয়ার ফিশন ঘটান হয় আর ফলে মুহূর্তে বিপুল পরিমাণ শক্তির সৃষ্টি হয়। ধারাবাহিক বিক্রিয়া ঘটাতে এবং এই বিক্রিয়াকে বশে রাখতে আবিষ্কৃত হয়েছে, পারমাণবিক চুল্লী (Atomic Reactor)।'

'পারমাণবিক চুল্লী কী?' ব্যস্তভাবে জিগ্যেস করল বীরু।

দাদু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হাঁ জেনে রাখা দরকার। বড় হয়ে যদি চুল্লী তৈরীকরতে পারিস, তাহলে ভারতের গৌরব বাড়বে। শোন তবে :

'চুল্লীর পুরো কাঠামোটি একটি দুর্ভেদ্য আচ্ছাদনে ঘেরা। ইস্পাত ও কংক্রিটের তৈরী। এটিকে বলে 'কনটেইনমেন্ট স্ট্রাকচার'। এর ভেতর দিকে থাকে আরও একটি ইস্পাতের প্রাচীর। কয়েকটি নিয়ন্ত্রিত আগমন-নির্গমনের ছিদ্র ছাড়া চুল্লীর অভ্যন্তরের সংগে বাইরের যোগাযোগের কোন রাস্তা নেই। চুল্লী চলাকালীন যে তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয়, সেটি যাতে বাইরে না বেরুতে পারে তার জন্যই এত সাবধানতা।

'চুল্লীর কেন্দ্রস্থলে থাকে একটি বড় সিলিণ্ডার। এটির ভেতরে সাজান থাকে মোটা মোটা চকচকে কয়েক হাজার ধাতব টিউব বা রড। লম্বায় প্রায় 12 ফিট। প্রতিটি রডের মধ্যে থাকে অন্তত: 200টি ছোট ছোট

ইউরেনিয়াম গুলি। গুলিগুলো লম্বায় এক ইঞ্চির কিছু কম, আর চওড়া হবে দুটি পেনসিলের মতো। গুলি তৈরী হয় ইউরেনিয়াম অক্সাইড দিয়ে। চুল্লীর মধ্যে মোট গুলির সংখ্যা হবে প্রায় আট কোটি। পারমাণবিক শক্তির উৎস হলো, ইউরেনিয়াম—235 বা প্লুটোনিয়াম—239। শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় চুল্লী মধ্যে মুহূর্তে ভেঙে ফেলা হয় অসংখ্য ইউরেনিয়াম পরমাণু। এতে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে চুল্লী ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। তাই তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয় নিয়ন্ত্রণ শলাকা (control rod)। শলাকা তৈরী হয় নিউট্রন শোষণকারী ধাতু বোরন বা ক্যাডমিয়াম দিয়ে। নিয়ন্ত্রণ-শলাকা ভেতরে ঠেলে দিলে শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার গতি কমে যায় আর টেনে নিলে গতি বাড়ে। তাছাড়া তাপ কমাবার জন্য রডগুলির চারধারে জল সরবরাহের সুব্যবস্থা আছে। তরল সোডিয়ামও এ-কাজে ব্যবহৃত হয়। চুল্লীর মধ্যে উৎপন্ন তাপ দিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হয়। ইউরেনিয়াম জ্বালানোর পর অনেক পারমাণবিক আবর্জনা (Nuclear Garbage) পড়ে থাকে। আবর্জনা মাঝে মাঝে পরিষ্কার না করলে চুল্লী অকেজো হয়ে যায়। এ-সব তেজস্ক্রিয় আবর্জনা নিয়ে আর এক বিরাট সমস্যা। আবর্জনা একেবারে নষ্ট করা অসম্ভব। তাই পরিবেশ থেকে এ-সব আলাদা ক'রে রাখা হয়। আবর্জনার মধ্যে যার তেজস্ক্রিয়তার তীব্রতা দীর্ঘস্থায়ী তা সুরক্ষিত আধারের মধ্যে রেখে মাটির গভীর স্তরে কবর দেওয়া হয়।

'পরমাণু বোমা বিস্ফোরণে মানুষের কী ক্ষতি হয় ?' হীরু ছটফটে গলায় জিগ্যেস করল।

মুখ-চোখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে দাদু বললেন, 'ক্ষতি বহুত। বলে শেষ করা যায় না। এর প্রভাব শুধু তাৎক্ষণিক নয়, বহু বছর পরেও এর প্রভাব বজায় থাকে।'

'বিস্ফোরণের তাৎক্ষণিক ফল ভয়াবহ। বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন তীব্র আলোর ঝলকানি ও প্রচণ্ড শব্দে মানুষ অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। প্রচণ্ড তাপে শুরু হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। দগ্ধ হয় জীবজন্তু, গাছপালা, বাড়ীঘর ইত্যাদি। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে শ্বাসরোধী অসহ্য গন্ধ। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয় পারমাণবিক ঝড়ের তাণ্ডব। ঝড়ের দাপটে অবশিষ্ট বাড়ীঘর, গাছপালা সবই ধূলিস্যাৎ হয় চোখের পলকে। অবশেষে শুরু হয় অঝোরে বারিবর্ষণ, তৈলাক্ত কৃষ্ণবর্ণের তেজস্ক্রিয় বৃষ্টি।

'বিস্ফোরণ কালে অসংখ্য কণিকা চারদিকে বেরিয়ে আসে। এই কণিকাগুলি হল পরমাণু-চূর্ণ। এদের নাম দেওয়া হয়েছে, তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা রেডিও নিউক্লাইডস্। আলোর চেয়েও সূক্ষ্ম। ভেদ করতে পারে অস্বচ্ছ স্থূল পদার্থ। রশ্মিগুলি চার প্রকার :

'(ক) আল্‌ফা রশ্মি (α-rays) : এগুলি সূক্ষ্ম কণিকার সমষ্টি। তেমন শক্তিশালী নয়। চামড়া ভেদ করে জীবদেহে ঢুকতে পারে মাত্র 0·1 মিলিমিটার পর্যন্ত। কিন্তু নিঃশ্বাসের সাথে যদি প্লুটোনিয়াম ঢোকে, তাহলে এর মধ্যে আল্‌ফা কণাও থাকে। এগুলি তখন ফুসফুসের কোষে ক্ষতিসাধন করে। ক্যান্‌সারও হতে পারে।

'(খ) বিটা রশ্মি (β-rays) : এগুলি হলো ইলেকট্রনের সমষ্টি। আল্‌ফা রশ্মির চেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী। জীবদেহের কয়েক সেন্টিমিটার ভেদ করতে পারে। অস্থিমজ্জা আর থাইরয়েড গ্লাণ্ডের ক্ষতি করে।

'(গ) গামা রশ্মি (γ-rays) : আলোর মতো এগুলি ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ। এক্স-রশ্মির মতো শক্তিশালী। কংক্রিট, সীসা ও স্টিলের আবরণ ভেদ করতে পারে খুব সহজেই।

'(ঘ) নিউট্রন রশ্মি : নিউট্রন কণিকার স্রোত। প্রচণ্ড শক্তিশালী। প্রথম তিনটি রশ্মি তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে কিন্তু নিউট্রন রশ্মি বেরিয়ে আসে যখন কৃত্রিম উপায়ে পরমাণু বিভাজন করা হয়।

'আল্‌ফা রশ্মির দেহকোষ ভেদ করাবার ক্ষমতা কম হলেও ক্ষতি করার ক্ষমতা বেশী। আল্‌ফা কণিকা দেহ সংস্পর্শে আয়নিত (Ionized) হয়। আয়নিত কণিকা দেহকোষে স্বাভাবিক রাসায়নিক ক্রিয়ার বিকার ঘটায়। বিটা ও গামা রশ্মি চামড়া ও মাংসপেশী ভেদ করে দেহের ভেতরে ঢুকে যায়। তারপর তাপে রূপান্তরিত হয়ে দেহ কোষে শোষিত হয়।

'রশ্মির পরিমাপের একক দু'প্রকার র‍্যাড্ (RAD = Radiation Absorbed dose) আর রেম (REM = Roentgen equivalent man)। বিটা, গামা ও এক্স-রশ্মির পরিমাপে র‍্যাড্ ও রেমে কোন তফাৎ নেই। তবে আল্‌ফা রশ্মির ক্ষেত্রে এক র‍্যাড্ = 20 রেম।

'600 রেম যদি মানুষের শরীরে ঢোকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে। 10 রেম লিম্ফ নোড, প্লীহা, অস্থিমজ্জা, রক্ত প্রভৃতির ক্ষতি করে।

'পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে শোষিত তেজস্ক্রিয় রশ্মির পরিমাণ অনেক বেশী। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু না হলেও মানুষকে ধীরে ধীরে মরণ ফাঁদে ঠেলে দেয়। অস্থিমজ্জা নষ্ট হবার জন্যে নোতুন লোহিত কণিকা উৎপন্ন হয় না। ফলে প্রচণ্ড অ্যানিমিয়া ও লিউকোমিয়া রোগ দেখা দেয়। রক্তে গ্রানুলোসাইট ও লিম্ফোসাইটের সংখ্যা কমে যায়। ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় বা নষ্ট হয়। নানাপ্রকার সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ ঘটে। তেজস্ক্রিয় রশ্মি গর্ভস্থ শিশুকে বিকলাঙ্গ বুদ্ধিহীন করে তুলতে পারে, এমন কি মেরেও ফেলতে পারে। সবচেয়ে ভয়ংকর হলো গামা রশ্মি। এর প্রভাবে দেহের কোষকলা পুড়ে যায়। মাইটোসিস বিভাজন বন্ধ হয়। ফলে জীবদেহের স্বাভাবিক কাজকর্ম দারুণভাবে ব্যাহত হয়। চামড়ায় দেখা দেয় প্রতিক্রিয়া। নানা প্রকার ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পৌষ্টিকতন্ত্রে বিভিন্ন উৎসেচক উপযুক্ত মাত্রায় ক্ষারিত হয় না। ফলে গা-গুলান, বমি, আন্ত্রিক গোলযোগ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। গামা রশ্মি জিন-সজ্জাকে ভেঙে এক নোতুন ধরণের জিন-সজ্জার সৃষ্টি করে অর্থাৎ মিউটেশান ঘটায়। এর ফলে ক্যান্সার রোগ দেখা দেয়। বিকৃত চেহারার বুদ্ধিহীন সন্তানের জন্ম হয়।

'বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি আকাশে পারমাণবিক মেঘ আকারে থাকে। বৃষ্টির সাথে মৌলগুলি পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। মাটিতে ও জলে জমা হয়। পানীয় জলের সংগে মৌলগুলি বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষের দেহে ঢোকে। উদ্ভিদ জলের সংগে তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি শোষণ করে। ঐ সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাংস ও দুধ যখন খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন মৌলগুলি অবশেষে মানুষের দেহেই ঢোকে। মৌলগুলি তারপর দেহমধ্যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে।

'পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে কেবলমাত্র আক্রান্ত দেশেরই যে ক্ষতি হয় তা না—ক্ষতি হয় সারা দুনিয়া জুড়ে। বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় ভস্ম বাতাসে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরিবেশের তেজস্ক্রিয় মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে ক্যান্সার ও তেজস্ক্রিয়তা জনিত অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।'

'পারমাণবিক শক্তি কী মানুষের কল্যাণ করতে পারে?' বীরু শান্তভাবে জিগোস করল।

দাদু হাসিমুখে বললেন, 'তা পারে। বিজ্ঞানের এটি এক অভূতপূর্ব

অবদান। হিংসার উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার না করে যদি কল্যাণের কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে পৃথিবীর চেহারাটাই একদিন বদলে যাবে। এটি তাপ-বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা মেটাতে পারে। পারমাণবিক শক্তি দিয়ে বিমান, জাহাজ, রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ, কলকারখানা প্রভৃতি চালান যায়। তাছাড়া অধিক ফসল ফলাতে এটি সাহায্য করতে পারে। আজকাল চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এটিকে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের কাজে লাগিয়েছেন। তেজস্ক্রিয় আইয়োডিনের সাহায্যে গলগণ্ড রোগ সেরে যায়। নিউট্রন রশ্মি ক্যান্সার রোগ নিরাময়ে সাহায্য করতে পারে। পারমাণবিক চুল্লীতে বিভিন্ন পদার্থের আইসোটোপ উৎপন্ন হয়। এগুলি চিকিৎসার কাজে লাগান যেতে পারে।'

'কিন্তু ওই সাধু?'

'তার সন্ধান পাইনি-রে।' দাদু হতাশ্বাস ফেললেন।